প্রতিচ্ছবি

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি বার্ষিক ম্যাগাজিন ২০২৫

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (দুর্বাসাদ)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেশনাল গ্র্যাজুয়েটদের উদ্যোগে আবাসন প্রকল্প।

Your Dream, Our Design, A Legacy Built Together.

প্রিয় স্বপ্নদ্রষ্টা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনাদেরকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রফেশনাল গ্র্যাজুয়েটদের নিবেদন ও দায়িত্বশীলতায় পরিচালিত আমাদের প্রকল্পসমূহ "ঢাকার বিভিন্ন প্রাইম লোকেশন, খুলনা ও কক্সবাজারে" সফলভাবে চলমান।

আমাদের প্রকল্পসমূহ:

আবাসন: বসুন্ধরা, আটি মডেল টাউন, মিরপুর ও খুলনা।
কমার্শিয়াল স্পেস: কারওয়ান বাজার ও কক্সবাজার
হোটেল ও রিসোর্ট: কক্সবাজার

আমাদের প্রতিশ্রুতি:

- ✓ ১০০% আইনি সুরক্ষা ও স্বচ্ছ ডকুমেন্টেশন
- ✓ দেশসেরা প্রফেশনাল কমিউনিটি
- ✓ সাশ্রয়ী ইনভেস্টমেন্টে প্রিমিয়াম লাইফস্টাইল
- ✓ কমিউনিটি-কেন্দ্রিক ডিজাইন
- ✓ গ্রিন, সাসটেইনেবল ও কেন্দ্রীয় লোকেশনে নির্মাণ
- ✓ নির্ধারিত সময়েই হস্তান্তর
- ✓ Project by Professionals, for Professionals

আপনার ইনভেস্টমেন্ট শুধু আজ নয়, আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যতের জন্যও।

Let's build something beautiful together.
Because your dreams deserve more than just bricks - they deserve belonging.

Arizona Holdings BD Ltd.
"Partners in Prosperity"
A Proud KU Professional Graduates Initiative.

For Sales Inquiry:

01840-737827, 01782-412014
01752-491363, 01339-752901-5
arizonaholdingsbd@gmail.com

ARIZONA HOLDINGS
PARTNERS IN PROSPERITY

www.arizonaholdingsbd.com youtube.com/@arizonaholdingsbd facebook.com/arizonaholdingsbd

প্রতিচ্ছবি

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি বার্ষিক ম্যাগাজিন ২০২৫

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

একরামুল হক
সুমাইয়া আক্তার

সম্পাদনা

মুহিব্বুল্লাহ
আলকামা রমিন

সম্পাদনা সহযোগী

মিরাজুল ইসলাম
খালিদ আহম্মেদ

প্রকাশকাল

এপ্রিল ২০২৫

ডিজাইন

HIERARCHY
COMMUNICATIONS

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি
কক্ষ নং - ১২১, প্রফেসর ড. গোলাম রহমান প্রশাসনিক ভবন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : kuja2020.21@gmail.com

ছবি: আব্দুল মান্নান রাসেল

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় লেক

ছবি: তানভীর ইসলাম

উপাচার্যের বাণী

গণমাধ্যম আজকের বিশ্বে এক অপরিহার্য শক্তি। তথ্যের অবাধ প্রবাহ, জনগণের মতামত প্রকাশ এবং জবাবদিহিতামূলক শাসন ব্যবস্থার বিকাশে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমটির ভিত শক্তিশালী করতে শিক্ষাঙ্গনে সাংবাদিকতা চর্চার গুরুত্ব অনেক বেশি, কারণ এখান থেকেই উঠে আসে ভবিষ্যতের দক্ষ, দায়িত্বশীল ও দেশপ্রেমিক সংবাদকর্মীরা।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্যরা যেভাবে সততা, পেশাদারিত্ব এবং বস্তুনিষ্ঠতা ধরে রেখে সাংবাদিকতা করে চলেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। তাদের লেখনীর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম, গবেষণা, সংস্কৃতি ও অর্জন সমূহের ইতিবাচক চিত্র গণমাধ্যমে উঠে আসছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সহায়ক।

আমি আনন্দের সঙ্গে জেনেছি যে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি তাদের বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিচ্ছবি' প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এ প্রয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণধর্মী ভাবনার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির এই মহতী উদ্যোগের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং 'প্রতিচ্ছবি'-র প্রকাশনার সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

প্রফেসর ড. মো: রেজাউল করিম
উপাচার্য
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

উপ-উপাচার্যের বাণী

সাংবাদিকতা শুধু পেশা নয়- এটি এক নিষ্ঠাবান সাধনা, যা সত্যের অনুসন্ধান, ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান এবং সমাজের প্রতিচ্ছবি উপস্থাপনের নিরন্তর প্রয়াস। একজন সংবাদকর্মী জনমানসের ভাবনা, রাষ্ট্রের গতি ও সমাজের সংবেদনশীলতা যথাযথভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারক ও বাহক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন।

তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ভূমিকা আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন প্রেক্ষাপটে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্যদের নিরলস চর্চা ও দায়িত্বশীলতায় আমি অত্যন্ত আশান্বিত। এই চর্চারই একটি সুন্দর প্রতিফলন হলো তাদের বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিচ্ছবি'- যা শিক্ষার্থীদের চিন্তা, কলম ও সৃজনশীলতা প্রকাশের একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠবে বলেই আমি মনে করি।

আমি এই ম্যাগাজিনের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।পাশাপাশি যারা এর নির্মাণে যুক্ত আছেন, তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রযাত্রায় একটি মূল্যবান সংযোজন হয়ে থাকবে 'প্রতিচ্ছবি'- এ প্রত্যাশা করি।

প্রফেসর ড. মোঃ হারুনর রশীদ খান
উপ-উপাচার্য
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

ট্রেজারারের বাণী

সমাজে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ নিয়ে অগ্রসর হওয়াই সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্য। শত প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জের মাঝেও সাংবাদিকদের অগ্রণী ভূমিকা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। এক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গনে গড়ে ওঠা সাংবাদিকদের অবদান অনস্বীকার্য।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (খুবিসাস) শুরু থেকেই সৃজনশীলতা, সততা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে ক্যাম্পাস সাংবাদিকতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা, বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি এবং জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলায় খুবিসাসের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

তাদের বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিচ্ছবি' প্রকাশের এই উদ্যোগ জ্ঞান চর্চা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে আরও বেগবান করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেমন নিজের দক্ষতা বাড়াতে পারবে, তেমনি জাতীয় পর্যায়ের গণমাধ্যমেও তারা একদিন গৌরবের সঙ্গে প্রতিনিধিত্ব করবে- এমন আশাবাদ রাখি।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির প্রতি রইলো আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সাংবাদিক সমিতি এগিয়ে যাক আলোকবর্তিকার মতো দৃপ্ত পদক্ষেপে।

প্রফেসর ড. মোঃ নূরুন্নবী
ট্রেজারার
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্র বিষয়ক পরিচালকের বাণী

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (খুবিসাস) প্রথম বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিচ্ছবি' প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এই শুভক্ষণে সংগঠনটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যকরী পরিষদের সকল সদস্য এবং খুবিসাসের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

তথ্য-প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে একটি নতুন তথ্য-যুগে পদার্পণ করেছে গণমাধ্যম। এর ক্ষেত্র বিস্তৃতির কারণে তথ্যের মহাসমুদ্রে কোনটি সংবাদ এবং কোনটি সংবাদ নয় তা নিয়ে ভাববার আগেই সংবাদ প্রকাশের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে অপতথ্য, ভুয়া তথ্য, ভুল তথ্য ইত্যাদি ছড়িয়ে যাওয়ায় সামাজিক সংকট তৈরি হচ্ছে। এই বাস্তবতায় সমাজের শক্তিশালী হাতিয়ার, সত্যনিষ্ঠতার দর্পণের অংশীদার হিসেবে সকল ধরনের স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সত্য প্রকাশে মনোযোগী হওয়া সকল সংবাদকর্মীর অবশ্যকর্তব্য।

খুবিসাসের সদস্যরা একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সাংবাদিকতা পেশায় ব্রতী হয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।তাদের এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

একই সাথে তারা তাদের অভিজ্ঞতা দেশ ও জাতির কল্যাণে ব্যবহার করে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সহযোগী হবে বলেও আমি প্রত্যাশা করি। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুস সাদাত
ছাত্র বিষয়ক পরিচালক
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

সভাপতির কথা

বাংলাদেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে দাঁড়িয়ে আজ আমরা এক নতুন সময়ের সাক্ষী। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর তৈরি হওয়া প্রেক্ষাপট আমাদের জাতীয় চেতনায় যে নাড়া দিয়েছে, তা কেবল রাজনীতিক পরিসরেই নয়, প্রতিফলিত হয়েছে জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও। তরুণদের চোখে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন- সততা, ন্যায্যতা, স্বাধীনতা ও নৈতিকতার ভিত্তিতে গঠিত একটি মানবিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। এই আলোড়িত সময়ের পরে আমাদের সামনে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে, তার প্রতিফলন ঘটানোর অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে সাংবাদিকতা।

সাংবাদিকতা কেবল একটি পেশা নয়, এটি সমাজের চেতনার প্রতিফলন। সাংবাদিকরা সত্য উদঘাটন করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে এবং গণমানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে। একটি দেশের গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার এবং স্বচ্ছতার ভিত্তি মজবুত করতে স্বাধীন, দায়িত্বশীল ও সাহসী সাংবাদিকতার বিকল্প নেই। তথ্যভিত্তিক এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ সমাজকে সচেতন করে, নাগরিকদের মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করে এবং রাষ্ট্রীয় জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ক্যাম্পাস সাংবাদিকতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে তৈরি করে সচেতনতা, বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈতিক নেতৃত্ব তৈরির পথ। এটি ছাত্রসমাজের ভাবনা, সংকট ও সম্ভাবনাকে সমাজের মূলধারায় তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ক্যাম্পাস সাংবাদিকরা ভবিষ্যতের গণমাধ্যম নেতৃত্ব গড়ে তোলার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়ম, সাফল্য ও সংস্কৃতির প্রতিবিম্ব তুলে ধরেন।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি ২০২০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি যাত্রা শুরু করে। সেই থেকে আজ ৫ বছর ধরে সত্য ও ন্যায়ের পথে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে সংগঠনটি। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই খুবিসাস সদস্যরা শিক্ষার্থীদের সাফল্য ও অর্জন গণমাধ্যমে তুলে ধরা এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ভূমিকা পালন করে আসছে। সাম্প্রতিক জুলাই গণঅভ্যুত্থান, সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাতিলের আন্দোলন, ভারত ও ইসরায়েল বিরোধী আন্দোলনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে নিরপেক্ষ ও সঠিক সংবাদ পরিবেশন করেছে। এছাড়াও একাডেমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক তথ্য সকলের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। সামনেও খুবিসাস তাদের এসকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

'প্রতিচ্ছবি' খুবিসাসের প্রথম প্রকাশনা। এটি আমাদের জন্য একটি নতুন যাত্রার সূচনা। এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় রয়েছে আমাদের শ্রম, সময় ও ভালোবাসা। আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ লেখায় এই সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করতে। প্রথম প্রকাশনা হিসেবে এতে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে, যা আমরা পরবর্তীতে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করব।

সবশেষে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই এই ম্যাগাজিন প্রকাশনার দীর্ঘ প্রচেষ্টায় যুক্ত আমার সহযোদ্ধা সমিতির সকল সদস্য, উপদেষ্টামণ্ডলী, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং আমাদের শুভানুধ্যায়ীদের, যাঁদের নিরলস শ্রম ও ভালোবাসায় আজকের এই ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে পেরেছি।

একরামুল হক
সভাপতি
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (খুবিসাস)

সাধারণ সম্পাদকের কথা

বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শুধু পড়ালেখা নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্র।এই সময়ে নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাগত অভিজ্ঞতা একজন শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রখর ও সুগঠিত করে তোলে। আর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি আমার জন্য ছিল এই অভিজ্ঞতা অর্জনের একটি সাবলীল পথ চলার মাধ্যম।

বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে প্রতিদিন ঘটে চলেছে অসংখ্য ঘটনা–একাডেমিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক কিংবা প্রশাসনিক। এসব ঘটনাকে নথিবদ্ধ করা, বিশ্লেষণ করা এবং তথ্যভিত্তিক উপস্থাপন করার কাজটাই করে থাকেন ক্যাম্পাস সাংবাদিকরা। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমরা যেমন অনেক প্রশংসা পেয়েছি, তেমনি বাধা-বিপত্তিও এসেছে। বিশেষ করে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনেক সময় নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করতে চান না। আবার অনেক সময় নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সংবাদ প্রকাশ করাটাই হয়ে দাঁড়ায় বড় চ্যালেঞ্জ।কিন্তু প্রতিটি প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে যখন একটি সঠিক ও তথ্যবহুল প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তখন সেটিই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

ডিজিটাল যুগে সাংবাদিকতা একটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কাগজে ছাপা সংবাদ থেকে মোবাইল স্ক্রিনে, মাইক থেকে পডকাস্টে, ক্যামেরার পেছন থেকে লাইভ স্ট্রিমে আমরা প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছি।

প্রত্যাশা এই যে,ক্যাম্পাস সাংবাদিকতা আরও প্রযুক্তিনির্ভর হোক, তথ্যভিত্তিক ও অনুসন্ধানী হোক। শুধু সংবাদ পরিবেশন নয়, বিশ্লেষণ এবং প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করাটাই হোক মূল লক্ষ্য। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি শুধু সংবাদ পরিবেশন করে থেমে থাকতে চায় না, এই সংগঠন থেকে উঠে আসুক ভবিষ্যতের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের সাংবাদিক। আশা করি, আমার এই প্রাণপ্রিয় সংগঠনটি দায়িত্ব, সততা ও সচেতনতাকে পাথেয় করে বহুদূর এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

সুমাইয়া আক্তার
সাধারণ সম্পাদক
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি

সম্পাদকীয়

শীতের এক সকালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ ক্যাম্পাসে আমাদের অনেকের যাত্রা শুরু হয়েছিল। চোখে ছিল বিস্ময়ের আলো, মনে অপার কৌতূহল, আর বুকভরা স্বপ্ন।সময়ের স্রোতে আমরা শিখেছি, গড়েছি, বেড়ে উঠেছি এই ১০৬ একরের জ্ঞানতীর্থে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ক্লাসরুম, ডিসিপ্লিন, বন্ধু কিংবা পড়ার টেবিলের চেয়ে বেশি সময় কেটেছে সাংবাদিক সমিতি ও এর সহকর্মীদের সঙ্গে।

প্রাণের এ বিদ্যাপীঠের অন্যতম স্পন্দিত নাম–খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (খুবিসাস)। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর।দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীদের ভাবনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তবতা, সম্ভাবনা আর সংকটকে মানুষের সামনে তুলে ধরার নিরলস চেষ্টা করে চলেছে সংগঠনটি।এই পথচলায় আমরা প্রথমবারের মতো খুবিসাসের বার্ষিক ম্যাগাজিন ‘প্রতিচ্ছবি’ প্রকাশ করতে পেরেছি। এটি নিছক একটি প্রকাশনা নয়, বরং আমাদের যাত্রার সাক্ষ্য ও চেতনার দলিল।

প্রতিচ্ছিবি-র সম্পাদক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে এর বাস্তবায়নে যে শ্রম, সময় ও মমতা প্রয়োজন ছিল, তার সবচেয়ে বেশি দিয়েছেন সমিতির সভাপতি একরামুল হক এবং তার পরেই সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুমাইয়া আক্তার-এর অবদান। তাঁদের নিরন্তর পরামর্শ, প্রেরণা ও সাহচর্য ছাড়া এই প্রয়াস সম্ভব হতো না। খুবিসাসের সকল সদস্য এবং কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতিটি সদস্য ছিলেন পাশে, নিঃস্বার্থভাবে, সাধ্যমতো। সবাইকে জানাই অন্তরের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা।

বিশেষভাবে শ্রদ্ধা জানাতে চাই খুবিসাসের উপদেষ্টামণ্ডলী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষককে, যাঁরা ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে লেখায়, চিন্তায় ও উৎসাহে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। এ ম্যাগাজিন তাঁদের সকলের সম্মিলিত শ্রমের ফসল।

এই ম্যাগাজিনে প্রকাশিত লেখাসমূহের তথ্য ও মতামত লেখকের একান্ত নিজস্ব; সেগুলোর দায়ভার সম্পাদনা পর্ষদ বহন করবে না। তবে আমরা যথাসম্ভব যত্ন নিয়ে সবকিছু গুছিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। তবুও অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুলভ্রান্তি থেকে থাকলে সেটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন–এই প্রত্যাশা।

আমরা চাই, প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠুক সেই আত্মপ্রকাশের আয়না, যেখানে শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন, চেতনা আর সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। খুবিসাস এগিয়ে চলুক সত্য, সততা ও সাহসিকতার পথে।

সূচিপত্র

আন্দোলনের দিনগুলোয় ক্যাম্পাস সাংবাদিকতা ১১

বাঙালি-মুসলমান দ্বন্দ্ব সমাসের ইতিহাস ১২
ফারুক ওয়াসিফ

চ্যালেঞ্জ নিয়েই সাংবাদিকতা করতে হবে ১৪
মোহসীন-উল হাকিম

ফ্যাসিবাদ কারে কয়? ১৬
ড. ইমরান কামাল

যুদ্ধ নয়, মানবতা চাই: ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত ও আমাদের দায় ১৮
অধ্যাপক ড. মো. খসরুল আলম

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি ১৯
আনিসুর রহমান

Geopolitical Relations in America and European perspectives: Implications for Asian Development ২০
Khan Mehedi Hasan phd

আবু সাঈদ থেকে নতুন বাংলাদেশ ২৩
কামরুজ্জামান হিমেল

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রজীবনে সাংবাদিকতার গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা ২৪
ড. মো. মতিউল ইসলাম

আদর্শের আঁচলে, দক্ষ সাংবাদিকতার গড়ে ওঠা ২৫
রেজওয়ান আহম্মেদ

সাংবাদিকতায় AI; ড্রাইভার নাকি প্যাসেঞ্জার! ২৬
মো: মেহেদী হাসান স্টার নিউজ

সংগ্রামের ইতিহাস ভুলে না বাংলাদেশ ২৭
গবেষক ইমরান মাহফুজ

দেশের সাংবাদিকতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ২৯
মশিউর রহমান

দায়িত্বের নামে আত্মপ্রচার বিপ্লবে এক অন্তঃসারশূন্য দ্বন্দ্ব ৩০
সুমাইয়া আক্তার

ভাবনা কাহারে বলে: গণমাধ্যম উপস্থাপনা ডিসকোর্স ৩১
কাজী জাওয়াদ মুর্শীদ

সংবাদের ভাষা: রূপান্তরের ধারায় সত্যের সন্ধান ৩৩
পলাশ মাহমুদ, কালবেলা

ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের হতাশ করেছে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ৩৪
মোহাম্মদ আজহার

জীববৈচিত্র্যপূর্ণ একটি পৃথিবীই আমাদের স্বপ্ন ৩৫
ড. আব্দুল হারুন চৌধুরী

মিডিয়ার বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জ ৩৯
সানজিদা আক্তার

ফেসবুক সাংবাদিকতা- তথ্য না আবেগের প্রতিচ্ছবি? ৪০
মো: হাসিবুল হাসান

সবুজের কোলে গড়ে ওঠা জ্ঞানের স্বপ্নপুরী ৪১
আলকামা রমিন

গণমাধ্যমে খুবিসাস ৪৩

ফিরে দেখা- ৪র্থ কার্যনির্বাহী কমিটি ৫৫

সারাদেশের সাংবাদিকদের পাশে খুবিসাস ৫৮

খুবিসাস ৪র্থ কার্যনির্বাহী পরিষদ পরিচিতি ৫৯

৪র্থ কার্যনির্বাহী কমিটিকে সারাদেশের শুভেচ্ছা বার্তা ৬১

পূর্ববর্তী কমিটির পরিচিতি ৬২

ছবি: তানভীর ইসলাম (পরিমার্জিত)

আন্দোলনের দিনগুলোয় ক্যাম্পাস সাংবাদিকতা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে দেশের প্রায় সব ক্যাম্পাসে। এই আন্দোলনকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন ক্যাম্পাসের সাংবাদিকরা। বিভিন্ন গণমাধ্যমে কাজ করা এসব সাংবাদিক আন্দোলনের খবর সংগ্রহ ও প্রকাশে ছিলেন সদা সচেষ্ট। কিন্তু পেশাগত দায়িত্ব পালনের পথে তাদের পোহাতে হয়েছে ছাত্রলীগ, প্রশাসন ও পুলিশের বাধা। তবুও তাঁরা থেমে যাননি প্রতিটি ঘটনার দৃশ্যমান ও অন্তরালের চিত্র তুলে ধরে আন্দোলনের গতি বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এই আন্দোলনে ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের ভূমিকা ছিল গভীর, নীরব এবং নিবেদিত। আন্দোলনে যেমন তাঁদের সরাসরি অংশগ্রহণ ছিল, তেমনি তাঁদের লেখনী ও ভিডিওচিত্রে উঠে এসেছে আন্দোলনের বাস্তব রূপ। ছাত্ররা এই আন্দোলন তৈরি করেছেন ভূমিকম্পের মতো, আর সেই কম্পন সারাদেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন ক্যাম্পাস সাংবাদিকরা। একজন ক্যাম্পাস সাংবাদিক একইসাথে একজন শিক্ষার্থী ও পেশাদার সংবাদকর্মী। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনের সময় সাংবাদিকদের নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে, কিন্তু সত্যকে সত্য বলায় তাঁরা কখনো আপস করেননি।

তাঁরা ছিলেন এ আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ও প্রকৃত কলমযোদ্ধা। রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে, সবধরনের বাধা-বিপত্তি ও ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা কাজ করে গেছেন। কখনো বসে, কখনো ছুটতে ছুটতে, আবার কখনো কাঁদানে গ্যাসের ঝাঁজে চোখ মুছতে মুছতে তৈরি করেছেন সংবাদ। এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতিতেও তাঁরা কখনো পিছু হটেননি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা পালন করেছেন পেশাগত দায়িত্ব।জুলাই মাসের ক্যাম্পাস পাতাগুলো সাক্ষ্য দেয়, ক্যাম্পাস সাংবাদিকরা কতটা নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সাথে কাজ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ক্যাম্পাস সাংবাদিকরা এই আন্দোলনে একসাথে তিনটি ভূমিকা পালন করেছেন আন্দোলনকারী, সাংবাদিক ও আন্দোলনকারী সাংবাদিক।

একটি অভিজ্ঞতা দিয়ে শেষ করছি। সাচিবুনিয়া বিশ্বরোডে আমাদের আন্দোলন চলছিল। হঠাৎ খবর এল ছাত্রলীগ ও পুলিশ হামলা করতে পারে। আমরা আন্দোলনের ভেতর থেকেই গলায় কার্ড ঝুলিয়ে "সাংবাদিক" বনে গেলাম। পাশে পুলিশের সঙ্গে চায়ের দোকানে গিয়ে আড্ডার ছলে খোঁজ নিতে থাকলাম, আদৌ হামলা হবে কিনা। এভাবেই তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবাদ ও লেখনীর মাধ্যমে ক্যাম্পাসের সাহসী কলমযোদ্ধারা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে গেছেন।

এই অভিজ্ঞতাগুলো মূলত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির আন্দোলনকালীন বাস্তবতা থেকে নেওয়া। যেখানে ক্যাম্পাস সাংবাদিকরা ছিলেন নীরব অথচ বলিষ্ঠ শক্তি।

আমি বাঙালি

বাঙালি–মুসলমান দ্বন্দ্ব সমাসের ইতিহাস

ফারুক ওয়াসিফ
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

১৮৭১ সালে ভারতবর্ষের এক ব্রিটিশ প্রশাসক উইলিয়াম হান্টার 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' বইটা প্রকাশ করেন। প্রথম বাক্য ছিল, 'আমাদের সীমান্তে বিদ্রোহীদের শিবির'। রিচার্ড ইটনের ফ্রন্টিয়ার (সীমান্ত) তত্ত্ব হয়তো এর কাছে খানিকটা ঋণী। হান্টার প্রশ্ন তোলেন: হু আর দি ইনডিয়ান মুসলমানস? প্রায় একইসময় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ও জানতে চান, কে বাঙালি মুসলমান? কোথা থেকে এলো তারা? এসব স্ফিংসীয় প্রশ্নের সামনে আজও জড়োসড়ো (ভারতীয় বা বাঙালি) মুসলমান। এই প্রশ্নের কাঠগড়া থেকে বাঙালি মুসলমান যে আজও বের হতে পারে নাই তার নমুনা বহুত। পরিচয় রাজনীতির দ্বারবানদের সামনে মুসলমান যে থতমত, তার সাক্ষ্য দেবে বাঙালি মুসলমান নিয়ে 'বাঙালি মুসলমানের মন' (আহমদ ছফা, ১৯৭৬) থেকে সাম্প্রতিক 'বাঙালি মুসলমান প্রশ্ন' (মাহমুদ হাসান, ২০২২)। প্রশ্ন যিনি করেন তিনি পরিচয় রাজনীতির দালানের দারোয়ান।প্রশ্ন করার ক্ষমতা আসলে রাজনৈতিক ক্ষমতা।

আহমদ ছফাও কুণ্ঠিত হয়ে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্নের দাপটে। এই প্রশ্ন বাংলাদেশি ইসলামিস্টদেরও তাড়া করে। বারেবারে তাঁরা বাঙালিত্বের পরীক্ষা দিতে বসেন। এটা কেবল হাস্যকরও না এটা তো ফাঁদ। বাংলার সব মানুষ ইহুদী, খ্রিষ্টান বা তালেবান হয়ে গেলেও বাঙালিই থাকবে, যতদিন না তারা বাংলা ভাষা ছাড়ে। বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা, বাঙালিত্বকে অসাম্প্রদায়িক করা এবং তাকে টিকিয়ে রাখায় বাঙালি মুসলমানের অবদান তো কারো চাইতে কম না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহিদদের তালিকাতেও সংখ্যায় তারাই বেশি। তারপরও তার হীনম্মন্যতা কেন? কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের ওই প্রশ্নের জবাবের ভাষা আজও তার আয়ত্বে নাই। সে পরীক্ষায় জয়ী, কিন্তু মার্কশিট তার হাতে নাই।

বাঙালিত্ব কোনো রেইস নয়। বাঙালিত্ব মানে যদি হিন্দুত্বই তাহলে আলাদা করে বাঙালি নামের পরিচয় থাকার দরকার হতো না। বাঙালি যখন মুসলমান কিংবা মুসলমান যখন বাঙালি, তখন বাঙালি পরিচয় উভয় ধর্মোত্তীর্ণ হয়ে যায়। বাঙালিত্ব মানে কেবল হিন্দুকে বোঝাত যদি মুসলমান বাঙালিত্বের শরিকানা দাবি না করত। বাঙালি-মুসলমান কি দ্বন্দ্ব সমাস? কার সঙ্গে কার দ্বন্দ্ব? বাঙালিত্বের সঙ্গে মুসলমানিত্বের? তাহলে প্রশ্ন, বাংলাভাষী মুসলমান কি বাঙালি নয়? মুসলমান হলে বাঙালি থাকা যায় না? বাঙালি আর হিন্দু কি তবে সমার্থক? যদি তা হয়, তাহলে বাঙালি হতে হলে বাংলাভাষী মুসলমানকে হিন্দু হতে হবে।

বাঙালিত্ব কি তবে কোনো ধর্ম যে মুসলমান ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে সেটা পালন করা যায় না? বাঙালিত্ব কি কোনো রেইস বা জাত বা বর্ণ যে, জন্মসূত্রে ছাড়া কারো পক্ষে বাঙালিত্বে দাখিল হওয়া অসম্ভব? তবে কি হিন্দু বিনা কেহ বাংলাবর্ষে বাঙালি হতে পারে না? ('বাঙালি মুসলমান কি দ্বন্দ্ব সমাস?/ফারুক ওয়াসিফ, বাসনার রাজনীতি কল্পনার সীমা, ২০১৫, আগামী প্রকাশন')

কিন্তু কী যুক্তিতে বাঙালিদের মধ্যে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং যারা বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের বড় অঙ্গ, তাদের বাঙালিত্বে সমান অধিকার থাকবে না? বাঙালি আর হিন্দু সমার্থক হলে যিনিই বাঙালি তিনিই হিন্দু। অর্থাৎ সব হিন্দুই বাঙালি, সব বাঙালিই হিন্দু।তাহলে 'বাঙালি' ও 'হিন্দু' দুটি শব্দ কেন দরকার হবে যদি দুটি 'পরিচয়' একই হয়?

তাহলে হিন্দুদের বাঙালি হওয়ার আর দরকার নাই, যেহেতু তাঁরা তা হয়েই আছেন। শুধু মুসলমানদের ওপর বাঙালি হওয়ার একটা আলাদা দায় বর্তায়। এই যুক্তি মতে, বাঙালি মুসলমানের বাঙালিত্ব জন্মগত নয়, তা সাংস্কৃতিকভাবে অর্জন করতে হয়। সেই অর্জনের জরুরি শর্ত হলো তার মুসলমানিত্ব খারিজ করা। কিন্তু চর্যাপদে যে বাঙালি বৌদ্ধ গণহত্যার কথা আসে, তারাও তো বাঙালি। আবার একাত্তরে যে বাঙালি নামের লোকেরা যুদ্ধ করেছিল তারা মূলত বাঙালি মুসলমান। বাংলা ভাষার জন্য জীবনও দিয়েছে তারা। আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির দুটি সর্বজনীন উৎসব; একুশের প্রভাতফেরি আর বৈশাখী শোভাযাত্রার উদ্ভাবনও তাদের হাতে। সেন আমলে বাংলা রাজ দরবারে সমাদর পেত না। বাংলা রাজভাষা হয় মুসলমান সুলতানি আমলে। বাংলা ভাষার বিস্তার ও সাহিত্যের উদয়ও সেসময়ের ঘটনা। মহাভারত ও রামায়ণের বাংলায়ন সেন আমলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল। সুলতানি আমলে তা পুরস্কৃত হলো।

বাঙালির গায়ে মুসলমানের যে অমোচনীয় দাগ লেগে গেছে, বাঙালিত্বের বিকাশে বাংলাভাষী মুসলমানের যে অবদান তা অস্বীকার করা আর মুসলমানকে কম বাঙালি বলা সমান কথা।

সাংস্কৃতিক বর্ণবাদ মুসলমানের বাঙালিত্বকে অস্বীকার করে সাংস্কৃতিক ফ্যাসিবাদের বীজ বুকে বহন করে চলছে। আবার উল্টোদিকে বাঙালি বিরোধী মুসলিম রাজনীতি হয়ে উঠতে চাচ্ছে গরিষ্ঠতাবাদী; আসলে যা ফ্যাসিবাদের আরেক চেহারা। যেহেতু বাঙালিত্ব কোনো ধর্ম নয়, সেহেতু কোনো ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে তার বিরোধ কল্পনা করা সাম্প্রদায়িকতা। কিছু ইসলামপন্থি ও কিছু হিন্দুত্ববাদী (এমনকি কিছু সেক্যুলারও) এভাবেই বাঙালি বিরোধিতায় একাকার হয়ে যান। এ থেকেই জন্মায় বাঙালি ও মুসলমানের ফুটবল খেলার দ্বন্দ্বতত্ত্ব।

বাঙালি পরিচয়টাকে যদি আমরা অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক করতে না পারি, তাহলে কখনো হিন্দু (পশ্চিম বাংলায়) এবং কখনো মুসলমান (বাংলাদেশে) পরিচয় নিয়ে হীনম্মন্যতা আসবে। বাঙালি ও মুসলমান দ্বন্দ্ব সমাস ভাবার ভুলটা ঊনিশ শতকে কলকাতায় তৈরি সাম্প্রদায়িক বাঙালিবাদের জের, এখনো অনেক সংস্কৃতিবাদী তাতে মজে আছেন। বাঙালি মানে যদি হিন্দুত্ব হয় তাহলে মুসলমান তা হতে চাইবে কেন? বাংলাদেশের বাংলাকে মুসলমানি বাংলা বলার জবাবে কি বলব ভারতীয় বাংলা হিন্দুয়ানি? ভাষার গায়ে সম্প্রদায় চিহ্ন থাকবেই। বাংলা ভাষার জন্ম সাঁওতালি-মুন্ডারি উৎস থেকে। একে সমৃদ্ধ করেছে সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি। ভাষাকে সেকুলার করা যায় না, ভাষা তার মানুষের মুখের পেঁয়াজ, সুক্তো, ঘরের ধূপ, আগর-আতর, সব কিছুর ঘ্রাণ বহন করতে চায়।ভাষা কখনো নাস্তিক হয় না। বাঙালি ও মুসলমান কোনো দ্বন্দ্ব সমাস নয়, এটা মিলনাত্মক ঐতিহাসিক সমাস হিসেবে নির্মাণ পেয়েছে। ভবিষ্যতে কী হবে জানি না, তবে যে হারে মুসলমানমনা একটি অংশ বাঙালিত্বকে বাদ দিয়ে 'শুদ্ধ' হতে চাইছে, তাতে মনে হচ্ছে বাঙালি হিসেবে তার যাবতীয় ঐতিহাসিক অর্জনকে বাদ দিয়ে দেউলিয়া হওয়াতেই তার সুখ। আত্মঘাতী বাঙালিরা দেশভাগ করেছিল, মুসলমানরা যদি বাঙালিত্বকে ভাগ করে; তবে সেটাও হবে মারাত্মক আত্মঘাত।

মোহসীন-উল হাকিম

বিশিষ্ট সাংবাদিক

ছবি: লেখকের ফেজবুক প্রোফাইল

চ্যালেঞ্জ নিয়েই সাংবাদিকতা করতে হবে....

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় পড়াশোনা করে শিক্ষার্থীদের অনেকেই চাইছেন সাংবাদিকতায় আসতে। কিন্তু বাবা মা চাইছেন না সন্তান পেশা হিসাবে সাংবাদিকতাকে বেছে নিক। এই সমস্যা নিয়ে গত এক বছরে অন্তত শ'খানেক শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাকে। জানতে চেয়েছি কেন অভিভাবকরা এভাবে ভাবছেন?

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গল্পে গল্পে যেটুকু জেনেছি তার সারমর্ম হলো যে সাংবাদিকদের এখন মানুষ সম্মানের চোখে দেখে না। সত্যিই তো। আমরা সবাই চাই একটি সম্মানজনক পেশা। সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দের গ্যারান্টি।দুটি বিষয়েই এখন সাংবাদিকতা পেশা হিসাবে ঝুঁকিতে। এর অনেকগুলো কারণও আছে।আবার ভবিষ্যতে যে পরিস্থিতি পাল্টাবে না তাও নয়। এবিষয়ে পরে আসছি। তার আগে নিজের জীবনের একটি গল্প বলি।

বাইশ বছর আগে সাংবাদিকতায় আসি। একটি জাতীয় পত্রিকায় শিক্ষানবীশ সাংবাদিক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেখে ইন্টারভিউ দেই। ঘটনাক্রমে সুযোগ পাই। কিছুদিন কাজ করতেই বাবা মা জানতে পারেন যে আমি সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি নিয়েছি। জানামাত্র ভীষণ হতাশ হয়েছিলেন তাঁরা। বলেছিলেন আমি যেন কিছুতেই এ পেশায় না যাই। তবে তখন সাংবাদিকতা নিয়ে তরুণদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। একুশে টিভির সংবাদ ও সাংবাদিকরা তখন রীতিমতো তারকা ব্যক্তিত্ব। সম্ভবত সেটিই আগ্রহ তৈরির কারণ ছিলো। আমি টেলিভিশনে সাংবাদিকতা করবো। বেশ আগ্রহ নিয়ে কাজ শিখছিলাম। কিন্তু বাবা-মা এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে আমার চাকরিটি চালিয়ে নেয়া বেশ চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে গেলো। তবুও ভাবলাম চ্যালেঞ্জ নেই। তার পরের পথে একের পর এক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছি।এখনও করছি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শুধু চ্যালেঞ্জ এর ধরনে পরিবর্তন এসেছে। তার মানে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে নেয়ার বিষয়ে অভিভাবকদের মনোভাব আগেও ছিলো। অতীতে এই পেশার সম্মান ছিলো। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দের গ্যারান্টি ছিলো না। আর এখন সাংবাদিকদের বেতনসহ সুযোগ সুবিধা অনেক বাড়লেও পেশার প্রতি মানুষের সম্মান কমেছে এই বিবেচনায় অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে নিতে দিতে চাচ্ছেন না। আর এই কারণে বিভ্রান্তিতে পড়েছেন সাংবাদিকতায় পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীরা। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাংবাদিকতা পড়ে করবেন কী শিক্ষার্থীরা?

আমার মতে, সাংবাদিকতা একটি ভিন্নধর্মী পেশা। স্বাধীন সাংবাদিকতা আছে বা নাই- এনিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু পেশা হিসাবে সাংবাদিকতায় যে স্বাধীনতা আছে তা নিয়ে সন্দেহ নাই। আমি অন্তত নিজের জীবন থেকে বলতে পারি যে আমি স্বাধীন ভাবে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি। কিছু সীমাবদ্ধতা ছাড়া বেশির ভাগ বিষয় নিয়েই কাজ করার সুযোগ আছে আমার সামনে। একজন রিপোর্টার তাঁর পছন্দ মতো বিট নিয়ে সাংবাদিকতা করতে পারেন। কেউ চাইলে ডেস্ক এ কাজ করতে পারেন। কেউ চাইলে টেলিভিশনে সংবাদ পাঠকের কাজ করতে পারেন। যেতে পারেন প্রোডাকশন বা অন্য কোনো সেকশনে। পত্রিকা আর মাল্টিমিডিয়া এখন কাজের সুযোগ অবারিত। তৈরি হয়ে কাজ শুরু করতে পারলে এখন আর একজন সাংবাদিককে ঠেকিয়ে রাখার সুযোগ আছে বলে মনে করি না। অন্যদিকে তরুনদের মধ্যে সাংবাদিকতায় আসার আগ্রহ আছে। সেখানে বাধ সাধছে অভিভাবকদের অনাগ্রহ। আজকের আলোচনা সে বিষয়েই। সাংবাদিক হতে চান এমন বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে যতটুকু জানতে ও বুঝতে পেরেছি তা হলো-

১। সাধারণ মানুষের কাছে সাংবাদিকদের প্রতি আস্থা কমেছে।

২। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মূল ধারার সংবাদ মাধ্যমের বেতন কাঠামো সুবিধাজনক নয়।

আমি বিশেষজ্ঞ নই। তবে সাধারণ একজন হিসাবে উপরের দুটি কারণ যদি বিদ্যমান থাকে তবে এই পেশার প্রতি তরুণদের আগ্রহ কমার কথা।

অভিভাবকদেরও এবিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব থাকা স্বাভাবিক। তাহলে সাংবাদিকতায় পড়া, সাংবাদিকতায় আগ্রহীদের কী হবে? তরুণরা না আসলে এই মাধ্যমেরই বা ভবিষ্যত কী? এনিয়ে বিশেষজ্ঞরা নিশ্চয়ই ভাববেন। আমি একজন সাধারণ সাংবাদিক হিসাবে নিজের মতামত তুলে ধরছি।

আমার মতে সাংবাদিকতা একটি অসাধারণ ও স্বাধীন পেশা। নানা প্রতিবন্ধকতা থাকলেও এই কাজে বৈচিত্র্য আছে। নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে পারলে এই পেশাতেও সাফল্যও আসে। বেতন ও সুযোগ সুবিধার বিবেচনায় এখন আমাদের অনেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত। ক্রেডিবিলিটি ধরে রাখতে পারলে মানুষের কাছেও আমরা সম্মান পাই। এর প্রমাণও আছে ভুরি ভুরি।

এবার নিজের বিষয়ে দুটি কথা বলি। ২৪ বছরের সাংবাদিকতা জীবনে আমার নাম হয়েছে সুন্দরবনের দস্যুমুক্তিতে অবদান রাখায়। এখানে সাংবাদিকতা করেছি আমি। আবার নাগরিক হিসাবে দস্যুদের আত্মসমর্পণে রাজি করিয়েছি, মধ্যস্ততা করেছি। সাংবাদিক বলেই এই কাজটি করা আমার জন্য সহজ হয়েছে। দিনের পর দিন দস্যুদের কাছে যেমন পৌঁছাতে পেরেছি অনায়াসে, তেমনি সরকারের শীর্ষ নীতি নির্ধারকদের সঙ্গেও কথা বলতে পেরেছি। দুই পক্ষের মধ্যে দূতিয়ালী করার কাজটি অন্য পেশাজীবী কারও জন্য সহজ ছিলো না। এখানে সাংবাদিকতার এথিক্স নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে প্রয়াত মিশুক মুনীর বলেছিলেন, মানুষের ভালো জন্য কাজ করতে কোনো বাধা নাই। যাই হোক প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ২০০০ সাল থেকে সাংবাদিকতা করছি। এর মধ্যে অনেক চ্যালেঞ্জ ও টানাপোড়েন গেছে।সেগুলো মোকাবেলা করে আমি টিকে আছি এই পেশায়। বেতন যা পাই তা দিয়ে মোটামুটি চলে যায়। নিজের গাড়ি বা বাড়ি সেই রোজগারে সম্ভব না, পারিওনি। তবে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের কাছে যথেষ্ট সম্মান পাচ্ছি। আর আমি মনে করি অনেক আরাম আয়েশের জীবন কাটাতে হলে যে টাকার প্রয়োজন তা শুধু সাংবাদিকতা নয় বেশির ভাগ চাকরিতেই তা সম্ভব নয়। তবে সম্মানজনক জীবন যাপনে এখনও সামগ্রিক ভাবে পরিবেশ তৈরি হয়নি। অনেক প্রতিষ্ঠানেই চলনসই বেতন কাঠামো নাই।প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইনস্যুরেন্সসহ অনেক কিছুই এখনও অনুপস্থিত বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আশা করি এসব ঠিক হবে। অতীতের বেতন কাঠামো ও সুযোগ সুবিধার সঙ্গে তুলনা করলে এক্ষেত্রে উন্নতির চিত্রই দেখি। আমি আশাবাদী। অর্থবিত্ত অর্জন করার ইচ্ছা থাকলে তেমন পেশাকেই বেছে নিতে হবে। ব্যবসা বা অন্য কোনো পেশায় যেতে হবে। নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে হয়তো কেউ কেউ সাংবাদিকতা পেশাকে ব্যবহার করে অর্থ সম্পদ গড়ে তোলেন, বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতিতেও কেউ কেউ জড়িয়ে পড়েন। তার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে অনেক বড় পরিসরে আলোচনা করা যেতে পারে। আমি আজকের আলোচনাতে থাকি।

আমি মনে করি সাংবাদিকতা একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা। নয়টা পাঁচটা অফিস করতে যাদের ভালো লাগবে না, যাঁরা স্বাধীন ভাবে নিজের কাজ করতে চান, যাঁরা দেশ ও মানব জাতির কল্যাণে অবদান রাখতে চান, যাঁরা সমাজের অসঙ্গতি মানুষের সামনে তুলে ধরতে চান তাঁদের জন্যই সাংবাদিকতা। চ্যালেঞ্জ থাকবেই। আর বড় কাজ করতে গেলে প্রতিবন্ধকতাও বেশি থাকবে। সেগুলোকে কাটিয়ে যারা এগিয়ে যেতে চান তাঁরাই আসবেন এই পেশায়। মনে রাখতে হবে- পুরো সমাজ যেদিকে যাবে সব পেশার মতো সাংবাদিকতাও সেদিকেই যাবে। তার মধ্যে থেকেও সঠিক সাংবাদিকতা করার বাস্তবতা এখনও রয়েছে। তাই যাঁরা সাংবাদিকতাই করতে চান তাঁরা আসুন এই পেশায়। ধরে থাকুন। লেগে থাকুন। দেখবেন আপাতদৃষ্টিতে সম্মান কমে যাওয়া এই পেশাতেই আপনি প্রতিষ্ঠিত হবেন, সম্মানও পাবেন। আমি নিজে তার প্রমাণ। এখন প্রশ্ন হলো, এবিষয়ে অভিভাবকদের আতঙ্ক কাটাবে কে? বাইরে থেকে গিয়ে তাঁদের এবিষয়ে বুঝানো সহজ নয়। এই দায়িত্ব শিক্ষার্থীদেরই নিতে হবে। বাবা মা-এর সামনে এই পেশার ভালো দিকগুলো তুলে ধরতে হবে। নানা কারণে সংবাদ মাধ্যমের ভবিষ্যত যে ভালো তা বুঝাতে হবে। আর এনিয়ে সংবাদ মাধ্যমগুলোর নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিদের অনেক বেশি করে ভাবতে হবে। মানুষের কাছে নিজেদের হারানো আস্থা ও সম্মান কী করে ফিরিয়ে আনা যায় সেবিষয়ে কাজ করতে হবে।

শেষ কথা, আপনার মন কী বলছে? পেশা হিসাবে মন যা বলবে সেটিকেই বেছে নিবেন। আর সাংবাদিকতা নিয়ে যে সংশয় রয়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা পাল্টে যাবে। আমরা যা করতে পারিনি তা নতুন প্রজন্ম করবে। সাংবাদিকতার সম্মানও আশা করি নতুনদের হাত ধরেই ফিরবে।

ছবি: লেখকের ফেসবুক প্রোফাইল

ছবি: সংগৃহীত

ফ্যাসিবাদ কারে কয়?

জর্জ অরওয়েল

অনুবাদ

ইমরান কামাল

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, খুবি

হাল আমলে আমাদের মধ্যে যে কয়টি লা-জবাব জিজ্ঞাসা তৈরি হয়েছে– ফ্যাসিবাদ কী?– তার মধ্যে অন্যতম। আমেরিকার এক সামাজিক জরিপ সংস্থা সম্প্রতি এই প্রশ্নে একশো জন ব্যক্তির ওপর জরিপ চালিয়েছে। এর যা ফল এসেছে তাতে দেখা যায়–গণতন্ত্র থেকে দানবতন্ত্র পর্যন্ত কোনো তন্ত্রই 'ফ্যাসিবাদ' তকমার বাইরে নেই। এই দেশে, আপনি গড়পড়তা চিন্তাশীল কোনো ব্যক্তির কাছে যদি ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞা জানতে চান, তাহলে সে জার্মান বা ইতালীয় শাসনব্যবস্থার দিকে আঙুল তুলবে। কিন্তু এই সারলীকরণে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি না। কারণ, ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রগুলোর কাঠামো ও ভাবাদর্শে যথেষ্ট ভেদ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জার্মানি আর জাপানকে একই রকম ফ্যাসিবাদী তকমায়, একই কাঠামোতে আটানো কঠিন। আরো কঠিন ছোট ছোট কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলোকে একই রকম ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে ভাবা। সাধারণত ধরে নেওয়া হয়, ফ্যাসিবাদ স্বভাবজাতভাবে যুদ্ধবাজ। ফ্যাসিবাদ বেড়েই ওঠে যুদ্ধের উন্মাদনায়।সে নিজের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান খুঁজে বেড়ায় যুদ্ধপরিস্থিতি এবং অপর দেশ দখলের মধ্যে। কিন্তু এই সংজ্ঞা কি পর্তুগাল বা দক্ষিণ আমেরিকার স্বৈরশাসনের ক্ষেত্রে সত্য–স্পষ্টতই না। ফ্যাসিবাদের আরেক বৈশিষ্ট্য ধরা হয়–অ্যান্টি-সেমিটিজম। কিন্তু দুনিয়ায় এমন ফ্যাসিবাদের নজিরও আছে যা অ্যান্টি-সেমিটিক নয়। কিন্তু শিক্ষিতের বিতর্ক, যা বছরের পর বছর ধরে আমেরিকান ম্যাগাজিনগুলোতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে, তা এখনও নির্ধারণ করতে পারেনি---ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদেরই আরেক রূপ কিনা? তারপরও জার্মানি, জাপান বা মুসলিনির ইতালির বেলায় আমরা যেভাবে ফ্যাসিবাদ শব্দটি ব্যবহার করি, তা থেকে বোধ হয় আমাদের এ প্রসঙ্গে সাধারণ বোঝাপড়া আছে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে শব্দটি এতো ভাবে, এতো কায়দায় ব্যবহৃত হয়েছে যে, এই শব্দ বা অভিধা নিয়ে আমাদের সেই সাধারণ বোঝাপড়াও এখন বিলুপ্তপ্রায়। প্রিয় পাঠক, আপনি যদি বিগত দশ বছরের সংবাদপত্রের দিকে তাকান, তাহলে দেখবেন গত দশ বছরে হেন কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠিত সংস্থা নেই যাকে ফ্যাসিবাদী বলে নিন্দা করা হয়নি। এখানে অবশ্যই আমি, 'ফ্যাসিবাদী' শব্দটির মৌখিক ব্যবহার সম্পর্কে কথা বলছি না। যা মুদ্রিত হয়েছে, বলছি তার কথা।আমি 'ফ্যাসিবাদের সমর্থক', 'ফ্যাসিবাদী প্রবণতা', অথবা শুধুই 'ফ্যাসিবাদী' শব্দগুলো নিম্নলিখিত জনগণের ওপর আরোপ হতে দেখেছি:

রক্ষণশীলরা: যারা রক্ষণশীল, আপসকামী বা আপসবিরোধী, আমি দেখেছি তাদেরকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ফ্যাসিবাদের সমর্থক বলে গণ্য করা হয়েছে।ভারতের ব্রিটিশ শাসন ও অপরাপর কলোনিতে উপনিবেশকদের যে শাসন চলছে তাকে নাৎসীবাদ থেকে আলাদা করা যায় না বলে মনে করা হয়েছে। যে সব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে দেশপ্রেমিক ও ঐতিহ্যবাহী বলে ধরে নেওয়া যায়, তাদেরকেও ক্রিপ্টো-ফ্যাসিবাদী বা ফ্যাসিস্ট মনোভাবাপন্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর নমুনা হিসেবে বলা যায়, ছেলেদের স্কাউট, মেট্রোপলিটন পুলিশ, এম.আই. ৫, ব্রিটিশ লিজিওনের কথা। মহাবাণী: 'পাবলিক স্কুলগুলোও নাকি ফ্যাসিবাদের আঁতুড়'।

সমাজতান্ত্রিকরা: পুরোনো কায়দার পুঁজিবাদের সমর্থকরা (যেমন, স্যার আর্নেস্ট বেন) দাবি করেন–সমাজতন্ত্র আর ফ্যাসিবাদ একই পদার্থ। এমন ক্যাথলিক

সাংবাদিক আছেন যারা দাবি করেন–বিশ্বযুদ্ধে নাৎসীদের দখলকৃত দেশগুলোতে সমাজতান্ত্রিকরাই ছিলো নাৎসী আর ফ্যাসিস্টদের প্রধান সহযোগী। একই অভিযোগ আবার কমিউনিস্ট পার্টিও তোলে অতি বাম, বিশেষ করে অরাজপন্থীদের বিরুদ্ধে। উনিশশো ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে 'দ্য ডেইলি ওয়ার্কার'-এ লেবার পার্টিকে 'শ্রম ফ্যাসিস্ট' বলে অভিহিত করা হতো। একই কথা অপরাপর চরম বামপন্থীদের যেমন অরাজপন্থীদের মুখ থেকেও শোনা গিয়েছে। ভারতেও এমন জাতীয়তাবাদী আছে যারা ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে ফ্যাসিবাদী সংগঠন বলে মনে করে।

কমিউনিস্টরা: এক উল্লেখযোগ্য চিন্তার মানুষেরা (রাউখনিং, পিটার ড্রাকার, জেমন বার্নহাম, এফ. এ. ভগট) নাৎসী আর সোভিয়েত শাসনের মধ্যে ফারাক বিচার করতে নারাজ। তাঁরা দাবি করেন, ফ্যাসিবাদী আর কমিউনিস্টরা একে অপরের দোসর। মানুষ হিসেবেও তারা নাকি কিঞ্চিৎ সমগোত্রীয়। 'টাইমস'-এর কর্তারা (যুদ্ধের আগে) সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি 'ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র' বলেই মনে করতেন। আবার অন্যদিকে, ট্রটস্কিপন্থী আর অরাজবাদীদের তরফ থেকেও একই উপাধি জুটেছিলো সোভিয়েত ইউনিয়নের।

ট্রটস্কিবাদীরা: কমিউনিস্টদের অভিযোগ–ট্রটস্কিবাদীরা নাৎসীদের সত্যিকারের দালাল।পপুলার ফ্রন্টের যুগে বামপন্থীরা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করতো–ট্রটস্কির রাজনৈতিক সংগঠন ফ্যাসিস্ট ভাবাপন্ন।নিজেদের অতি ডান আমলে কমিউনিস্টরা ডান-বাম যেকোনো গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একই অভিযোগই আনতো। যেমন: কমনওয়েলথ বা আই.এল.পি।

ক্যাথলিকরা: ক্যাথলিক চার্চকে প্রায় সর্বত্রই 'ফ্যাসিবাদের সমর্থক' তকমা দেওয়া হয়েছে।

যুদ্ধবিরোধীরা: প্যাসিফিস্ট এবং অপরাপর যুদ্ধবিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে–তারা অক্ষশক্তির জন্য পরিস্থিতি সহজ করে দিচ্ছে।তাদের বিরুদ্ধে আনা আরো গুরুতর অভিযোগ–ফ্যাসিবাদী অনুভূতি যুদ্ধবিরোধীরাও ধারণ করে।

যুদ্ধের সমর্থকরা: যুদ্ধ বিরোধীরা তাদের দাবির পক্ষে যুক্তি দেয় এই বলে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নাৎসীবাদের চেয়ে খারাপ। সমস্যার সামরিক সমাধানে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের তারা ফ্যাসিবাদী বলে চিহ্নিত করে থাকে। পিপলস্ কনভেনশনের সমর্থকরা প্রায়ই দাবি করে, নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ইচ্ছা প্রকারান্তরে ফ্যাসিবাদকেই সমর্থনের লক্ষণ। জাতীয় রক্ষী বা হোম গার্ড যখন আত্মপ্রকাশ করে তখনই একে একটি ফ্যাসিবাদী সংগঠন বলে নিন্দা করা হয়েছিলো। এর বাইরে আছে, গোটা বামগোষ্ঠী যারা সামরিকতন্ত্র মানেই বোঝে ফ্যাসিবাদ। রাজনৈতিকভাবে সচেতন সৈনিকরা তাদের অফিসারদের হয় মনে করে 'ফ্যাসিস্ট ভাবাপন্ন', নয় 'হুদাই ফ্যাসিবাদী'। লোকে মনে করে–যুদ্ধ-প্রশিক্ষণ স্কুল, সৈনিকের ঝকঝকে তীক্ষ্ন পোশাক, অফিসারদের স্যালুট সবকিছুই ফ্যাসিস্ট মনের সহায়ক। যুদ্ধের আগে সীমান্তরক্ষী বাহিনীতে যোগদানও ফ্যাসিবাদের লক্ষণ বলে মনে করা হতো। সেনাবাহিনীতে নিয়োগ আর পেশাদার সেনাবাহিনী দুইকেই গণ্য করা হতো ফ্যাসিবাদী কাণ্ড হিসেবে।

জাতীয়তাবাদীরা: জাতীয়তাবাদকে সাধারণত ফ্যাসিবাদী আন্দোলনই মনে করা হয়। এই মনে করাকে আবার বুঝতে হবে বক্তার অবস্থান থেকে। অর্থাৎ বক্তা ঠিক কোন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ফ্যাসিবাদী মনে করছে সেই দিক থেকে। সাধারণত বক্তা যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করে না, তাকেই ফ্যাসিবাদী বলে আখ্যা দেয়। আরব জাতীয়তাবাদ, ফিনিশ জাতীয়তাবাদ, ভারতীয় কংগ্রেস পার্টি, মুসলিম লীগ, জায়নবাদ, আই,আর.এ সব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকেই কোনো না কোনো সময় ফ্যাসিবাদী তকমা দেওয়া হয়েছে।অবশ্যই তা একই ব্যক্তি বা বক্তার পক্ষ থেকে ঘটেনি। এভাবে জায়গায়-বেজায়গায় বহুল ব্যবহারের ফলে 'ফ্যাসিবাদ' শব্দটিই এক নিরেট অর্থহীন প্রলাপে পরিণত হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন কতাবার্তায় এর দশা আরো বেহাল। আমি---কৃষক, দোকানদার, ধার-জমা, দৈহিক দণ্ড, শিয়াল শিকার, ষাঁড়ের লড়াই, ১৯২২ সালের কমিটি, ১৯৪১ সালের কমিটি, কিপলিং, গান্ধী, চিয়াং কাই-শেক, সমকামিতা, প্রিস্টলির সম্প্রচার, যুবক হোস্টেল, জ্যোতির্বিদ্যা, নারী, কুকুর এমন আরো বহু কিছুর উপর শব্দটি প্রয়োগ করতে শুনেছি। তবে এই সমস্ত বিশৃঙ্খলার তলে ফ্যাসিবাদের এক প্রকার সুপ্ত অর্থ নিশ্চয়ই রয়েছে। প্রথমত, এটা স্পষ্ট যে, ফ্যাসিবাদী শাসন আর গণতান্ত্রিক শাসনের মধ্যে বড় পার্থক্য আছে। যার কিছু কিছু খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায় কিন্তু সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। দ্বিতীয়ত, যদি মনে হয় 'ফ্যাসিবাদ' মানেই 'হিটলারের প্রতি সমর্থন' তাহলে উপর্যুক্ত নমুনাগুলোর মধ্যে কয়েকটি অবশ্যই অন্যগুলোর চাইতে বেশি ন্যায়সঙ্গত। তৃতীয়ত, যারা ভীষণ অবজ্ঞায় 'ফ্যাসিবাদ' শব্দটি যেখানে-সেখানে ছুঁড়তে থাকেন, তারা সম্ভবত একে আবেগ দিয়ে মোকাবিলা করতে চান। 'ফ্যাসিবাদ' বা 'ফ্যাসিস্ট' শব্দ দ্বারা তারা সাধারণত নিষ্ঠুর, নির্দয়, ঔদ্ধত্যপূর্ণ, অজ্ঞতার পক্ষে, মুক্তি-বিরোধী, স্বাধীনতা-বিরোধী, শ্রমিক-বিরোধী–এই জাতীয় কিছু বোঝাতে চান। প্রকৃতই ফ্যাসিবাদ সমর্থন করেন এমন অল্প সংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া, প্রায় সবাই আজ 'ফ্যাসিস্ট' শব্দটিকে একটি সাধারণ গালিতে পরিণত করেছেন। ব্যবহারের অত্যাধিক টানাহেঁচড়ায় শব্দটি এখন নিরেট অর্থহীন বুলি–আর এই অর্থহীনতাই এখন এর সংজ্ঞায় পরিণত হয়েছে।

কিন্তু আমরা তো জানি, ফ্যাসিবাদ একটি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নাম। তাহলে কেন আমরা শব্দটির কোনো স্পষ্ট এবং সাধারণ সংজ্ঞা খুঁজে পাচ্ছি না? দুর্ভাগ্যবশত! আমরা খুঁজে পাবোও না। এ কথার ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক দীর্ঘ সময় লাগবে, কিন্তু আসল কথা হলো- ফ্যাসিবাদকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা অসম্ভব। কারণ, তা করতে গেলে এমন কিছু কথা মেনে নিতে হবে, যা ফ্যাসিস্ট, রক্ষণশীল, বা নানান ধাতের সমাজতন্ত্রিক- কেউই স্বীকার করতে চাইবেন না। এই পরিস্থিতিতে আমরা যা করতে পারি: গালি বা অভিশাপের পর্যায়ে নামিয়ে না এনে শব্দটিকে একটু ভেবেচিন্তে প্রয়োগের অভ্যাস।

ছবি: জেনোসাইড ওয়াচ

যুদ্ধ নয়, মানবতা চাই: ফিলিস্তিন–ইসরায়েল সংঘাত ও আমাদের দায়

অধ্যাপক মো. খসরুল আলম

বিএ ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

পৃথিবীর মানচিত্রে প্রতিনিয়তই কোথাও না কোথাও সংঘাত চলছে। তবে কিছু যুদ্ধ ইতিহাসের পাতা ছাপিয়ে মানবতার অন্তরাত্মায় আঘাত হানে। ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত তেমনই এক অধ্যায়, যা শুধু ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নয়–এটি আমাদের সভ্যতা, বিবেক ও মানবিক চেতনার এক নির্মম পরীক্ষার মঞ্চ। প্রতিদিন আমরা শুনছি মৃত্যুর হিসেব–আজ ৫০ জন শিশু, কাল ৩০ জন নারী। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া জীবনের আর্তনাদ যেন এখন আমাদের চেনা শব্দ হয়ে উঠেছে। অথচ প্রতিটি সংখ্যার পেছনে আছে একটি গল্প, একটি পরিবার, একটি ভবিষ্যৎ। যদি আমরা সেই গল্পগুলো শুনতে পেতাম, দেখতে পেতাম তাদের চোখের ভাষা–তাহলে হয়তো পরিসংখ্যান নয়, প্রতিটি মৃত্যু আমাদের কাছে হতো একেকটি কষ্টের গর্জন।

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা আজ এক খোলা কবরস্থানে রূপ নিয়েছে। নেই পর্যাপ্ত হাসপাতাল, নেই খাদ্য বা পানির স্বাভাবিক সরবরাহ। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো চিৎকার করে বলছে–"এটি যুদ্ধ নয়, এটি গণহত্যা।" অথচ বড় পরাশক্তিগুলো তখনও কূটনৈতিক ভাষায় বিবৃতি দিচ্ছে, 'উদ্বেগ প্রকাশ করছি।' শিশুদের মৃতদেহ দেখে উদ্বেগ যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন কার্যকর পদক্ষেপ এবং সেই পদক্ষেপ আসা উচিত একান্তভাবে মানবতার ভিত্তিতে। জাতিসংঘের প্রস্তাব কিংবা রাজনৈতিক চাপের বাইরেও ইসরায়েলের নিরাপত্তার কথা বলা হয়। কিন্তু নিরাপত্তা কি শুধুই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য? একজন শিশুর কান্না যদি নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, তবে সেই নিরাপত্তা আসলে কাদের জন্য? রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার অজুহাতে যদি একটি গোটা জনগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়–তবে সেই রাষ্ট্রব্যবস্থার ন্যায়ের ভিত্তি কতটুকু দৃঢ়, তা ভাবা জরুরি। ইতিহাস সাক্ষী, শত বছর ধরে ফিলিস্তিনিরা এই ভূমিতে বসবাস করে আসছে। ১৯৪৮ সালের 'নাকবা' (বিপর্যয়) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তারা বারবার উচ্ছেদ, বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার। ঘরছাড়া হওয়া, জমি দখল, বেআইনি বসতি নির্মাণ–এসব এখন আর শুধু ইতিহাসের দলিল নয়, বরং প্রতিদিনকার বাস্তবতা। বাংলাদেশ একটি মানবিক রাষ্ট্র, যে জাতি স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছে, দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। এমন একটি জাতির মানুষ হিসেবে আমরা নিশ্চয়ই নির্লিপ্ত থাকতে পারি না। একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের দায়িত্ব কেবল পাঠদান নয়; মানবিকতা ও ন্যায়ের পক্ষে সচেতন প্রজন্ম গড়ে তোলা। শিক্ষার্থীদের আমরা শুধু বইয়ের পাতা নয়, জীবনের পাঠও দিই। ফিলিস্তিন ইস্যু সেই পাঠের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া উচিত। তরুণেরা যেন বোঝে–বিচারহীনতা, নিপীড়ন ও দখলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই প্রকৃত শিক্ষার রূপ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমরা অনেকেই ফিলিস্তিনের পক্ষে আওয়াজ তুলছি। তবে সেই আওয়াজ যেন কেবল হ্যাশট্যাগে সীমাবদ্ধ না থাকে। আমাদের নিজেদের ভেতর মানবিক চেতনা জাগ্রত করতে হবে–ধর্ম, রাজনীতি কিংবা জাতিগত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে। একটি শিশু যদি আজ খাবার না পায়, যদি তার হাসি গোলার শব্দে চাপা পড়ে–তবে আমরা কেউই প্রকৃত অর্থে নিরাপদ নই। এই মুহূর্তে দরকার বিশ্বব্যাপী মানবিক ঐক্যের। যুদ্ধ থামানো, মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া এবং একটি স্থায়ী, শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে পাওয়া এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘ, মানবাধিকার সংস্থা, সংবাদমাধ্যম–সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। তবে তারও আগে দরকার আমাদের বিবেকের জাগরণ। কেননা, বিবেকহীন বিশ্বে কোনো সমাধানই টেকসই হয় না।

এই যুদ্ধের কোনো জয়ী নেই। এক পক্ষ হয়তো বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হবে, অন্য পক্ষ হয়তো সাময়িক শক্তি প্রদর্শন করবে কিন্তু পরাজিত হবে মানবতা, পরাজিত হবে আমাদের সভ্যতা। আসুন, আমরা কেউই যেন এই পরাজয়ের শরিক না হই।

ছবি: সংগৃহীত

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি

প্রফেসর ড. মো. আনিসুর রহমান
সিএসই ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

ষাটের দশকের শুরুতে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে উচ্চশিক্ষার প্রসারে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জোরালোভাবে উঠে আসে। সেই প্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে কুদরাত-ই-খুদা কমিশন খুলনা বিভাগে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করে। ১৯৭৯ সালে মন্ত্রিপরিষদে একটি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। এরপর ১৯৮৫ সালের ১৪ নভেম্বর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একাডেমিক ও প্রশাসনিক রূপরেখা প্রণয়নের জন্য "জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী কমিটি" গঠিত হয়। একই বছরের ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব এম. মহবব-উজ্জামান-এর নেতৃত্বে আরেকটি কমিটি গঠিত হয়।

এ পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি কোথায় স্থাপিত হবে তা নিয়ে খুলনা, যশোর ও বরিশাল অঞ্চলের মানুষ নিজ নিজ এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করতে থাকেন। তবে খুলনার জনগণ দলমত নির্বিশেষে একত্রিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। বলা হয়ে থাকে, স্বাধীনতার পর খুলনাবাসীর কোনো একক দাবিতে এত ঐক্য ও সংহতি আর দেখা যায়নি। ১৯৮৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে খুলনাবাসী নিজেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামফলক উন্মোচন করবেন—এই ঘোষণা দেয় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন সমন্বয় কমিটি।

হাজারো মানুষ ওই দিন গল্লামারীর দিকে রওনা হন। আন্দোলনের তীব্রতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সেদিন সকাল সাড়ে ১২টায় পাকিস্তানের সাবেক কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী ও আন্দোলনের সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট এ. এইচ. দেলদার আহমেদ গল্লামারীর পরিত্যক্ত বেতার ভবনের সামনে খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের পাশে 'খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়' লিখিত একটি নামফলক স্থাপন করেন।

এই ঘটনা খুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এরই প্রেক্ষিতে সেদিন রাতেই বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে খুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সরকারি ঘোষণা প্রচারিত হয়। পরদিন খুলনাবাসী এই ঘোষণায় বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠে।

পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালের ৪ জানুয়ারি এ সংক্রান্ত সরকারি গেজেট প্রকাশিত হয় এবং ১২ জানুয়ারি প্রথম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয়। পর্যায়ক্রমে কয়েকজন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালনের পর ১৯৮৯ সালের ১ আগস্ট প্রফেসর ড. গোলাম রহমান প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনিই পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯০ সালের জুলাই মাসে জাতীয় সংসদে 'খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আইন' বিল হিসেবে পাস হয়। ১৯৯১ সালের ৩১ আগস্ট চারটি ডিসিপ্লিন—কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, স্থাপত্য, নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা এবং ব্যবসায় প্রশাসন—নিয়ে ক্লাস শুরু হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে একাডেমিক কার্যক্রমের উদ্বোধন হয় ২৫ নভেম্বর ১৯৯১, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মাধ্যমে।

এরশাদ সরকারের শাসনামলে ছাত্ররাজনীতির নামে নানাবিধ হানাহানি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলতে দেখে প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতির প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। ফলে তারা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেন যে, তারা ক্যাম্পাসে কোনো প্রকার লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হবেন না। পরবর্তী ব্যাচগুলোর শিক্ষার্থীরাও এই মনোভাবকে ধারণ করে ক্যাম্পাসকে রাজনীতিমুক্ত রাখে। এর সুফল হিসেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাস ও সেশনজটমুক্ত ক্যাম্পাস হিসেবে টিকে থাকতে পেরেছে।

চার বছরের ডিগ্রি যেখানে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ে চার বা পাঁচ বছরেও শেষ হয় না, সেখানে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচ মাত্র তিন বছর নয় মাসে, ১৯৯৫ সালের জুনে স্নাতক সম্পন্ন করে। পরবর্তী ব্যাচগুলোর শিক্ষার্থীরাও সেশনজটমুক্ত থেকে যথাসময়ে ডিগ্রি অর্জন করতে পেরেছে।

ভবিষ্যতেও এই ক্যাম্পাস লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতিমুক্ত থাকবে—একজন প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী হিসেবে সেটাই আমার প্রত্যাশা।

সূত্র: খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস, প্রফেসর মো. বজলুল করিম।

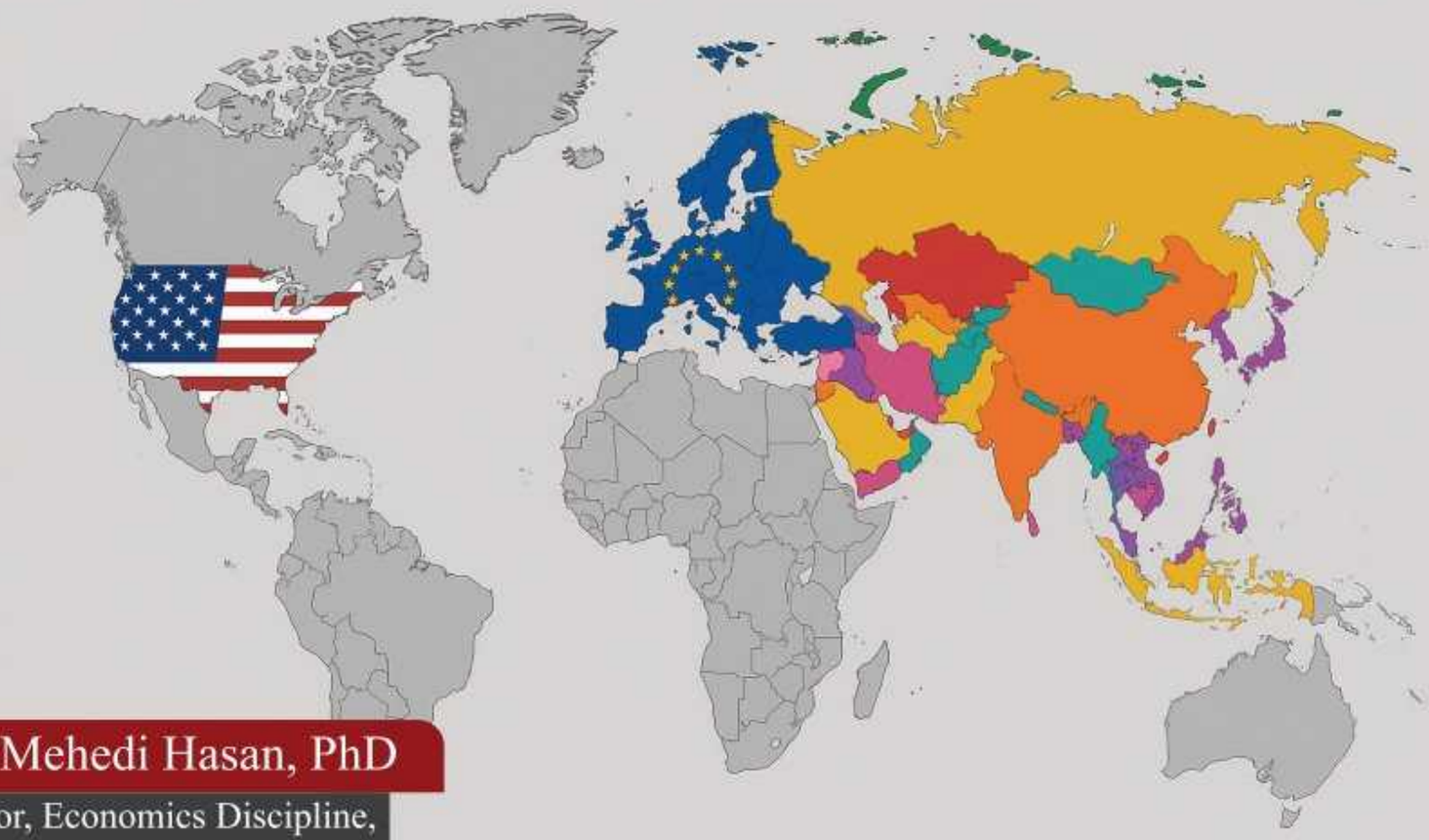

Khan Mehedi Hasan, PhD
Professor, Economics Discipline,
Khulna University

Geopolitical Relations in America and European Perspectives: Implications for Asian Development

With the pace of globalization, interconnectivity of trade, commerce, investment, human and factor mobility among nations has increased. Countries have also liberalized their trade and immigration policies. As a result, some countries in particular regions have better connectivity with others and accordingly enjoy benefits from multiple perspectives.

The European Union (EU) consists of 27 almost neighboring and geographically connected countries that enjoy borderless travel. Better political harmony and liberal trade policy have augmented trade and investment among member countries. The leadership and compromising tendencies of a few countries like Germany, France, Italy, etc., have also contributed to better harmony—even though most EU member countries were engaged in the devastating World War II and other wars. England, France, and several EU countries were part of the Allied forces, whereas Germany and Italy were in the Axis powers. Germany and Italy had wars with France, England, Poland, Denmark, and Norway with massive brutality. Surprisingly, those enemy nations formed the EU after the end of WWII. The EU came into force in 1993, but the process began in 1951 through the establishment of the European Coal and Steel Community (ECSC), just five years after the end of WWII. The current intra-EU trade share of its total trade is about 60 percent, which reflects strong cohesion even after WWII-era hatred. The EU also assists its members during economic downturns and acts as an iron shield against external (non-member) threats.

Europe was a major trading partner of the USA for a long time, even immediately before WWII. Germany and the USA experienced massive war during WWII. But in 1947, just two years after the end of WWII, the USA initiated the Marshall Plan. The US-financed plan aimed to recover war-damaged European economies. Germany, being the largest country in the EU, was a significant beneficiary of the Marshall Plan, which strongly supported its transformation into a strong industrial nation. Other EU countries also benefited immensely. It is noteworthy that the USA aided its enemies so that they could become economically powerful and, subsequently, strong American trading partners in both exports and imports. Since then, the USA has had strong ties with the EU. Both parties have benefited economically and politically from the Marshall Plan, which helped reinforce the US-dominated world order. Due to favorable trade policies, the USA and Canada—neighboring countries—maintain a very high intra-trade ratio. Canada has a much smaller economy compared to the USA; however, 77% of Canada's total

exports go to the USA, and about 63% of its imports come from the USA. This is an example where a big and a small economy share a high-level reciprocal trade.

Asia is home to more than 60 percent of the world's population. The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) has an intra-trade share of about 25% of the region's total trade. Unfortunately, South Asia experiences only 5% intra-regional trade, which is tremendously unsatisfactory, considering the region is home to more than 25% of the global population. Asia vividly demonstrates rivalry among neighbors. North Korea and South Korea clearly show hostile relations and minimal trade. China and India experience border conflicts and rivalry in regional geopolitics. They show no signs of mutual economic cooperation, though they maintain some trade relations, mostly driven by private sector initiatives. Both countries comprise more than two-fifths of the global population and have a substantial and rising middle-class population. If they could enhance trade between themselves, both could secure massive markets for sustained economic growth. Although both countries maintain economic relations with most Asian countries, they compete with each other in maintaining economic and political influence. Despite the presence of both powers, we do not notice any joint effort between them, which clearly indicates conflict, hatred, and rivalry. Moreover, many Asian countries exhibit China-biased or India-biased government policies depending on the ruling regime. Governments often face pressure from both powers when shaping international relations—this is evident in countries like Bangladesh, Nepal, Maldives, Sri Lanka, and others.

India and Pakistan demonstrate border conflicts at regular intervals and generally take opposite stances on most national, regional, and global issues. Both countries share massive cultural and culinary similarities, which could serve as the basis for strong bilateral trade—an opportunity that remains untapped. Instead, both countries spend enormous amounts on security due to national-level hostility, even though HDI data shows that both nations require huge investments in education, health, sanitation, and regional economic development. Tariff and non-tariff barriers and intentional delays at land borders are major impediments to bilateral trade. Because of these challenges, some India-Pakistan trade is routed via the UAE, which increases trade costs and is burdensome for consumers. Bangladesh and Pakistan also maintain very poor trade and political relations, although they have formal diplomatic relations and missions in each other's countries. We do not notice any significant governmental efforts from either side since their toxic relationship stemming from the Liberation War of 1971—despite huge trade potential in garments, leather products, and other sectors.

India and Bangladesh share about 4,000 km of accessible land border, which provides a significant incentive for bilateral trade due to low transportation costs and faster transaction times. India will also be affected as Bangladesh is a major market for trade and investment. India exported US$11.25 billion to Bangladesh in 2023, and Bangladesh exported about US$11.25 billion to India in the same year. Both countries experience significant flows of goods, people, and finance through tourism, medical tourism, management, and employment. However, both countries also face recurring conflicting issues, such as water disputes, land and water border conflicts, border killings, sudden stoppages of exports and imports, and a significant trade gap. After the July 2024 revolution in Bangladesh, political and economic relations between India and Bangladesh have been reshaped and drastically worsened. Currently, India provides a limited number of tourist visas and transit facilities to Bangladesh, while Bangladesh is reconsidering its existing ties, agreements, and economic relations with India. We do not notice any significant high-level progress or even concrete steps to resolve bilateral conflicts. Rather, media outlets are fueling hostility and clashes between the countries, which is deeply unsatisfactory and harmful to both. Bangladesh is striving to explore alternative trade sources, investments, and development partners. Bypassing India for trade would be time-consuming and costly. However, if trade and economic relations with India are not trustworthy and mutually beneficial, Bangladesh would logically seek alternatives. Mutually respectful and bene

ficial trade, economic, and political relations could benefit both countries—deviation from which could lead to divergence from both ends. Trade with neighboring countries offers low transport costs and quicker transactions. Recognizing this, South Asian countries formed SAARC to foster better economic and political ties. But the initiative did not succeed due to apathy among member countries and an excessive external focus. Some ASEAN countries have proposed and discussed visa-free policies and liberal trade frameworks at different times but have yet to achieve any concrete results.

Differences in opinion and ideology among nations are quite common and realistic, as political parties and governments often represent different social, political, and economic ideologies. However, neighboring coun tries must work hand-in-hand. Despite differences, Europe and America have ample examples of mutual agreements and collaborations that have benefited them. In contrast, we do not observe sufficient political and ideological commitment among most Asian countries—an approach that violates economic rationality. Like-minded attitudes and country-level cohesion are not automatic outcomes; they are the result of deliberate actions. Major economies such as China, Japan, and India must take the lead in ensuring better regional connectivity, much like Germany and France led the formation of the European Union. Better Asian cohesion will also increase its collective bargaining and negotiation power with the rest of the world. Globalization has made it easier for countries to trade even with remote regions and has expanded alternatives. Therefore, uncongenial regional relations will invite foreign intrusion into the Asian market—a leading problem for Asian economies. Africa's intra-trade ratio to its total trade is very low due to a lack of political harmony. With a massive population, growing demand, and abundant supply, Asia has the potential to benefit tremendously through greater regional harmony.

This is the author's own perception and opinion and does not reflect any party or organization.

ইলাস্ট্রেশন: The Business Standard (পরিমার্জিত)

আবু সাঈদ থেকে নতুন বাংলাদেশ

কামরুজ্জামান হিমেল
সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (বেরোবিসাস)

আলোর মশাল হাতে নিয়ে নেতৃত্ব দিতে পারে খুব কম মানুষই। তার জন্য দরকার হয় অসীম সাহস। তেমনি এক সাহসী যোদ্ধা বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ।

দেশজুড়ে প্রথমে শুরু হয় শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশীদের কোটা সংস্কারের আন্দোলন। আন্দোলন শুরু হয় রাজধানী ঢাকায়। পরবর্তীতে আন্দোলন বিস্ফোরণে প্রধান নিয়ামক হয়ে যায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। দিনটা ছিল ১৬ই জুলাই। ঘটনা শুরু আগেরদিন ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি কোটা আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হওয়ায় সাঈদকে হুমকি ও চড় থাপ্পড় মারেন। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত সাঈদ শক্তি পায় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।ঘটনার দিন সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় থমথমে পরিবেশ বিরাজমান। কোটা আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের কর্মসূচির পূর্বেই ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও পুলিশ পার্কের মোড় এলাকায় অবস্থান নেন। একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। সেখানে প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়।

ঘটনার একাধিক ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, ১৬ জুলাই কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের কর্মসূচি চলাকালে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের সড়কে পুলিশ আবু সাঈদকে খুব কাছ থেকে গুলি করে। আর আবু সাঈদ এক হাতে লাঠি নিয়ে দুই হাত প্রসারিত করে বুক পেতে দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি লুটিয়ে পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে নিরস্ত্র আবু সাঈদের পুলিশ কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হওয়ার ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে সারা দেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যেন দাবানলে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে।এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সোচ্চার হন বহু মানুষ, তাতে আরও গতিশীল হয় কোটা সংস্কার আন্দোলন। পরবর্তীতে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আন্দোলনে যোগ দেয়। ওই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ছাত্র-জনতার বিক্ষোভের মুখে গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। তাতে বাঙালী ফিরে পায় নতুন বাংলাদেশ।

ময়নাতদন্তের বিষয়ে চিকিৎসকদের রিপোর্ট অনুযায়ী, পুলিশের ছোরা গুলিতে আবু সাঈদের মৃত্যু হয়েছে। ১০ মিটারের মধ্যে গুলি করায় তাঁর (সাঈদ) শরীরের ভেতরের কিছু অঙ্গ ফুটা হয়েছিল। যাঁর কারণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়। ময়নাতদন্তকারী এই চিকিৎসকের মতে, এটি একটি হত্যাকাণ্ড।

টগবগে তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। তাকে ঘিরে তার এলাকার মানুষ স্বপ্ন দেখতেন। সেই সাঈদের মরদেহ নিয়ে যাওয়া অসহ্য কষ্টের। অন্য যেকোনো দিন সাঈদ বাড়িতে গেলে মা-বাবা গভীর আনন্দের সাথে অপেক্ষা করতেন। সেদিন অপেক্ষা করছিলেন মরদেহ দেখার জন্য। গর্ভে ধারণ করা বাবা-মায়ের মনে কত ঝড় যে বয়ে গেছে আমরা কি তার সামান্যটুকুও উপলব্ধি করতে পারব? মধ্যরাতের অন্ধাকার ভেদ করে কান্নার করুণ সুর সেদিন উপস্থিত সকলকে স্পর্শ করেছে। মা-বোন-স্বজনের আর্তনাদে উপস্থিত অনেকের চোখ ভিজেছে। বাবার পাথরদৃষ্টিতে গড়িয়ে পড়েছে অশ্রু। বাবার কাঁধে সন্তানের লাশের বোঝার যে যন্ত্রণা তা বহন করতে হয় আবু সাঈদের বৃদ্ধ পিতাকে।

ছোটবেলা থেকে মেধার পরিচয় দিয়ে বেড়ে উঠছিলেন আবু সাঈদ। তার লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহ করার মতো সামর্থ্য পরিবারের ছিল না। নিজের পড়ালেখার ব্যয় নিজেই নির্বাহ করতেন। লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ারও উপক্রম হয়েছিল কখনো কখনো। আবু সাঈদের বাড়িতে থাকার আলাদা কোনো ঘর ছিল না। দুভাই এক বিছানায় থাকতেন। বাবা সামান্য জমি থেকে একটা অংশ বিক্রি করেছেন ঘর তোলার জন্য। দেয়ালটুকু কেবল তুলেছেন।পরিবারের সদস্যরা বলছিলেন সাঈদ বড় চাকরি করবে- এটা তার স্বপ্ন ছিল।৫৬ শতাংশ কোটা থাকলে সেই স্বপ্ন পূরণ করা যে কিছুটা কঠিন সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।ফলে কোটা সংস্কারের দাবিতে গড়ে ওঠা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে তিনিও যুক্ত হন। মেধাবী সাঈদ বৈষম্যের সাথে আপোষ করলেন না। নিজের প্রাণ দিয়ে দেখিয়ে দিলেন এই বাংলায় বৈষম্যের ঠাঁই নাই। আর আমরা পেলাম নতুন এক বাংলাদেশ।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রজীবনে সাংবাদিকতার গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা

প্রফেসর ড. মোঃ মতিউল ইসলাম
এগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিন,
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় জীবন কেবল শিক্ষার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় শিক্ষার্থীরা নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হয়।সাংবাদিকতা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে একটি বিশেষ ক্ষেত্র, যা শিক্ষার্থীদের নানাবিধ দক্ষতা অর্জনের সুযোগ করে দেয়।এটি শুধু শিক্ষার্থীর ক্যারিয়ার গঠনে সহায়তা করে না, বরং তাকে একজন সচেতন, দায়িত্বশীল এবং জ্ঞানী নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

সাংবাদিকতার গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করতে পারি:

১. নিজের চিন্তাশীলতা এবং সৃজনশীলতার বিকাশ: বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষার্থীদের নিজের চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের একটি দারুণ মাধ্যম! সংবাদ লেখা, ব্লগ, কিংবা মতামতমূলক নিবন্ধ লিখে একজন শিক্ষার্থী তার সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে পারে।এটি শুধু তার লেখনীর দক্ষতাই বাড়ায় না, বরং আত্মবিশ্বাস এবং সাহসিকতাও বৃদ্ধি করে।একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান ও লেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গভীর চিন্তাভাবনা করার অভ্যাস গড়ে তোলে।

২. সাম্প্রতিক তথ্য ও সমসাময়িক বিষয়ের প্রতি সচেতনতা : সাংবাদিকতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।প্রতিদিনকার ঘটনা পর্যবেক্ষণ, সংবাদ বিশ্লেষণ, এবং তথ্য সংগ্রহের অভ্যাস তাদের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে জানার আগ্রহ বাড়ায়।এই জ্ঞান তাদের জীবন ও ভবিষ্যত পরিকল্পনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. গবেষণা এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতার বিকাশ : সাংবাদিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো গবেষণা এবং তথ্য বিশ্লেষণ। একটি সংবাদ তৈরি করতে হলে সঠিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় এবং তা যাচাই-বাছাই করতে হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা গবেষণা দক্ষতা এবং সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষমতা অর্জন করে, যা যেকোনো পেশায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি : সাংবাদিকতা শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে।প্রতিবেদন তৈরি, সাক্ষাৎকার নেওয়া, এবং জনসাধারণের সাথে যোগাযোগের অভিজ্ঞতা একজন শিক্ষার্থীকে ভাষা, সম্পর্ক স্থাপনের কৌশল এবং উপস্থাপনা দক্ষতায় পারদর্শী করে তোলে।

৫. নেতৃত্ব ও সংগঠনের দক্ষতা : বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সংগঠন বা ক্যাম্পাস পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকা শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব গুণাবলির বিকাশ ঘটায়।একটি দলের সঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে তারা নেতৃত্ব দেওয়া, কাজের সময়সীমা মেনে চলা, এবং দায়িত্ববোধ শেখে। এসব গুণাবলি ভবিষ্যতে তাদের পেশাগত জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. সামাজিক সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি : সাংবাদিকতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবগত হয়। তারা অসামঞ্জস্য, অন্যায় এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলার সুযোগ পায়। ফলে তাদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা এবং দায়িত্ববোধ তৈরি হয়।এটি তাদের শুধু একজন শিক্ষার্থী নয়, বরং একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

৭. ক্যারিয়ার গঠনের সুযোগ : বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতায় যুক্ত থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি কার্যকর ক্যারিয়ার গঠনের মাধ্যম হতে পারে।গণমাধ্যম, টেলিভিশন, রেডিও, এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাদের ভবিষ্যৎ পেশাগত জীবনে কয়েক ধাপ এগিয়ে রাখে।

৮. মানবিক মূল্যবোধ গঠন : সাংবাদিকতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনযাপন, সমস্যা এবং সংগ্রাম সম্পর্কে জানতে পারে। এটি তাদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ, সমবেদনা এবং সহমর্মিতা তৈরিতে সাহায্য করে।

৯. ডিজিটাল সাংবাদিকতা : বর্তমান যুগে ডিজিটাল সাংবাদিকতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।ব্লগিং, সোশ্যাল মিডিয়া, এবং অনলাইন নিউজ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিশ্বব্যাপী তাদের চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দিতে পারে।এটি তাদের দক্ষতা এবং আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সাংবাদিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। এটি শিক্ষার্থীদের মেধা ও দক্ষতা বিকাশের পাশাপাশি তাদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তোলে। সমসাময়িক বিষয়ের প্রতি সচেতনতা, গবেষণা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন করে শিক্ষার্থীরা শুধু নিজেদের জন্য নয়, বরং সমাজ এবং জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই শিক্ষার্থীদের উচিত বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সাংবাদিকতার মতো একটি সৃজনশীল এবং দায়িত্বশীল ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটানো।

আদর্শের আঁচলে, দক্ষ সাংবাদিকতার গড়ে ওঠা

রেজওয়ান আহম্মেদ

সাবেক সভাপতি,
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি

গণমাধ্যমের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সাথে সাথে সাংবাদিকতা পেশাটিও হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয় ও মর্যাদাপূর্ণ একটি পেশা। একবিংশ শতাব্দীতে এসে উন্নয়নশীল বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও সাংবাদিকতা নিয়ে আগ্রহ বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে।এরই ধারাবাহিকতায় ক্যাম্পাস সাংবাদিকতারও ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।সাংবাদিকতা শেখার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ক্যাম্পাস সাংবাদিকতাকে ধরা যায়।দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা এই চর্চার সুযোগ পাচ্ছেন।শুরুর কিছু সংকোচ, সীমাবদ্ধতা থাকলেও সময়ের সাথে সাথে সততা, নৈতিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতাকে অবলম্বন করে একজন ক্যাম্পাস সাংবাদিক গড়ে ওঠেন একজন দক্ষ ও পেশাদার সংবাদকর্মী হিসেবে।

কিছু স্বপ্নবাজ তরুণ ক্যাম্পাসে নিত্যদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনাসহ তুলে ধরেন নিজের ক্যাম্পাসের সুযোগ সুবিধা-সম্ভাবনা ও অসঙ্গতিসহ নানান বিষয়।তবে সাংবাদিক হিসেবে তাদের সকল স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা সুখকর হয় না।তাদেরকে প্রথম আক্রমণের শিকার হতে হয় কথিত পক্ষ-বিপক্ষ অবলম্বনের সমালোচনার মাধ্যমে। 'প্রশাসনের অন্যায়', 'অন্যায্য সিদ্ধান্ত', 'একনায়কতন্ত্র' ' প্রশাসনের পদত্যাগ চাই' ইত্যাদি শব্দগুলো সাংবাদিকরা ব্যবহার করতে পারেন না বলে তাদেরকে 'প্রশাসনের দালাল' হিসেবেও আক্রমণ করা হয়। মাঝে মাঝে আবার অন্যায় কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ পরিবেশনের ফলে ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের রোষানলের শিকারও হতে হয় তাদের। অনেকেই তো আবার তাদেরকে পাইকারী দরে সাংবাদিকতা শেখাতে শুরু করেন।

কিন্তু এদের অধিকাংশই রীতিমত স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাংবাদিকতা বিভাগে অধ্যয়ণরত। যারা সাংবাদিকতায় পড়াশোনা করেন না, তারাও শাস্ত্র কতৃক বেঁধে দেওয়া সীমার বাইরে যান না বা যেতে পারেন না। কোন কোন ঘটনার দৃষ্টিকোণে হয়তো শিক্ষার্থীদের মতের অমিল ঘটে থাকে। এটা সাংবাদিকতার 'আনএভেয়ডএবল লিমিটেশন' বা অপরিহার্য সীমাবদ্ধতা। তবে এটা সত্যটুকু অন্তত এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই যে, তারা কোন মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ঘটনা তাদেরকেও আন্দোলিত করে। এমনকি তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও আবেগ থাকে ওইসব ঘটনা সম্পর্কিত।কিন্তু পেশাদারিত্বের প্রশ্নে তাদের অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হয়।কারন একসাথে সাংবাদিক এবং এক্টিভিস্ট হওয়ার সুযোগ নাই। এদিকে ভিন্নরকম চ্যালেঞ্জ থাকে প্রশাসনের নিকট থেকে তথ্য পেতে। প্রশাসন তথ্য দিয়ে সহায়তা করলেও সংবাদে ইতিবাচক এঙ্গেলের জন্য নানা উছিলায় ও নানা ঢঙে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। চাপ প্রয়োগ না করলেও সাংবাদিকদের সংবাদ প্রকাশে নানা পরামর্শ নিশ্চিতভাবে সাংবাদিকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। আবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে ছাত্রত্ব বাতিল বা সার্টিফিকেট আটকে রাখার হুমকি শুনতে হয়নি এমন সাংবাদিকের সংখ্যা খুবই কম। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্যাম্পাস সাংবাদিকরা সেটা উতরে যেতে পারেন। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার হয়েছেন, মামলার মুখোমুখী হয়েছেন এমন অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাদের ঝুলিতে। নামমাত্র বেতনে বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনা বেতনে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের এসব বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা নানা ক্ষেত্রে নতুন নতুন কাজের অনুপ্রেরণা যোগায়। তবে এসবের বাইরেও ক্যাম্পাস সাংবাদিকরা তাদের প্রতিভা, দক্ষতা ও সৃজনশীলতা দিয়ে হয়ে ওঠেন ক্যাম্পাসের প্রাণভোমরা।শিক্ষার্থীদের অধিকার নিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে কথা বলে হয়ে ওঠেন তাদের প্রিয়মুখ।আমার কখনও কখনও শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে সেতুবন্ধন রচনা করেন প্রশাসনের সাথে।ক্যাম্পাসের সার্বিক অগ্রগতি ও বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে থাকেন তারুণ্যদীপ্ত এ সাংবাদিকেরা। বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের নিয়ে গড়ে উঠতে দেখা যায় সাংবাদিক সমিতি, প্রেসক্লাব, রিপোর্টার্স ইউনিটি, ইয়ুথ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন সহ নানা সাংবাদিক সংগঠন। এসব সংগঠনগুলো সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি ক্যাম্পাস সাংবাদিকতায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য সাংবাদিকতা বিষয়ের উপর কর্মশালাসহ নানামুখী আয়োজন করে থাকে। এতে আগ্রহীরা খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জেনে যেকোনো বিভাগের শিক্ষার্থীরা যুক্ত হতে পারে এ মহান পেশায়। এই সংগঠনগুলো ভবিষ্যতের দক্ষ সাংবাদিক তৈরির মঞ্চ হিসেবে কাজ করছে।

সাংবাদিকতায় AI: ড্রাইভার নাকি প্যাসেঞ্জার!!!

মো: মেহেদী হাসান

সিনিয়র ডিজিটাল মিডিয়া এক্সিকিউটিভ, স্টার নিউজ
সাবেক সভাপতি, বুটেক্স সাংবাদিক সমিতি

একটা সময় ছিল, যখন সাংবাদিকতা মানেই ছিল মাঠে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ, কলমে লেখালেখি আর কাগজে ছাপা সংবাদ। সময় বদলেছে, বদলেছে প্রযুক্তির রূপ। আর সেই পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে সাংবাদিকতাতেও। আজকের এই ডিজিটাল যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence - AI) সাংবাদিকতায় এনেছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে অধ্যয়নরত ও সাংবাদিকতার সাথে সম্পর্কিত শিক্ষার্থীদের জন্য এই বিষয়টি জানা শুধু সময়োপযোগী-ই নয়, বরং অপরিহার্য। চলো জেনে আসি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কিছু কাটখোট্টা সংজ্ঞায়ন। সোজা কথায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এমন একটি প্রযুক্তি, যা মানুষের মতো চিন্তা করতে, সিদ্ধান্ত নিতে ও সমস্যা সমাধান করতে পারে। এটি মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং এবং প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ (Natural Language Processing - NLP) এর মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাজ করে। AI এমনভাবে তৈরি, যেন এটি তথ্য বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে, যা আগে কেবল মানুষই পারত। তাহলে AI কি মানুষের জায়গা দখল করে নিচ্ছে, ধাপে ধাপে জানবো সেটা...

সংবাদ সংস্থাগুলো যেমন Associated Press (AP), Reuters, Bloomberg নিয়মিত AI ব্যবহার করে নির্দিষ্ট ফরম্যাটের সংবাদ তৈরি করছে। উদাহরণ দিতে গেলে বলা যায়, খেলা, আবহাওয়া, অর্থনীতি কিংবা শেয়ারবাজার সম্পর্কিত ডেটাভিত্তিক সংবাদগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে AI দ্বারা লেখা হয়। এই প্রযুক্তিকে বলা হয় "Automated Journalism" বা "Robot Journalism।" অটোমেটেড জার্নালিজমটা বুঝতে, একটি ক্রিকেট ম্যাচকে আমরা গিনিপিগ বানাতে পারি। আমরা যে বল বাই বল স্কোর দেখি সেটার সাহায্যেই AI একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখে ফেলতে পারে। এতে সংবাদ প্রকাশের গতি যেমন বাড়ে, তেমনি রিপোর্টাররা তাদের মনোযোগ দিতে পারেন অনুসন্ধানী ও বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন তৈরিতে। সাংবাদিকতার অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো ভুয়া তথ্য বা গুজব চিহ্নিত করে সত্যতা যাচাই করা। AI এখন এ কাজটিও করে দিচ্ছে খুব দক্ষতার সঙ্গে। Full Fact, ClaimBuster, Google FactCheck Tools- এসব টুলস বিভিন্ন ওয়েবসাইট, সামাজিক মাধ্যম ও নথিপত্র বিশ্লেষণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য যাচাই করতে পারে। বিশেষ করে নির্বাচনের সময় বা রাজনৈতিক প্রচারণায় যখন ভুয়া তথ্যের ছড়াছড়ি হয়, তখন এই ধরনের AI-সিস্টেম সত্য ও মিথ্যার ভেদরেখা তৈরি করতে সাহায্য করে। প্রতিদিন হাজারো সংবাদের ভিড়ে পাঠকের পছন্দ অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক সংবাদ তুলে ধরা সহজ নয়। AI এর মাধ্যমে এখন পাঠকের আচরণ বিশ্লেষণ করে (যেমন: কী পড়ছে, কতক্ষণ সময় দিচ্ছে), তার ভিত্তিতে খবর সাজানো হয়। Google News, Flipboard, এমনকি Facebook News Feed-এও এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে পাঠক যেমন তার পছন্দমতো সংবাদ সহজে পাচ্ছেন, তেমনি সংবাদমাধ্যমও জানতে পারছে কোন ধরণের কনটেন্ট বেশি জনপ্রিয়।

ভুয়া খবর বা "Fake News" এখন বিশ্বজুড়ে একটি বড় সমস্যা। AI প্রযুক্তি ছবি বিশ্লেষণ, উৎস যাচাই, ভাষার ধরণ, এমনকি পোস্টকারীর ইতিহাস খতিয়ে দেখে সন্দেহজনক সংবাদ শনাক্ত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ফেসবুক পোস্টে বলা হলো– "একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।" AI তখন দেখবে, এটি কোন সূত্র থেকে এসেছে, অন্যান্য বিশ্বস্ত মিডিয়ায় এই খবর আছে কিনা, ছবিটি এডিটেড কি না–সবকিছু মিলিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় সংবাদটি সত্য নাকি গুজব। বহুভাষিক দেশে সংবাদ অনুবাদ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। AI আজ সেই কাজটিও করছে সফলভাবে। Google Translate, DeepL, এমনকি কিছু মিডিয়া হাউজ নিজেদের AI অনুবাদক তৈরি করেছে, যাতে এক ভাষার সংবাদ দ্রুত অন্য ভাষায় প্রকাশ করা যায়। ফলে ভাষাগত সীমাবদ্ধতা কমে যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার সাথে সম্পর্কিত শিক্ষার্থীদের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সম্পর্কে জানা এখন সময়ের দাবি। কারণ, আগামী দিনের সাংবাদিকতায় শুধু ভালো লেখক হলেই চলবে না–প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে, জানতে হবে কোন টুল কীভাবে কাজে লাগাতে হয়। AI-ভিত্তিক নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র যেমন 'ডেটা জার্নালিজম', 'AI কনটেন্ট অ্যানালিস্ট' কিংবা 'ফ্যাক্ট-চেকার' হিসেবে কাজের নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি, সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদনের ক্ষেত্রও অনেক বিস্তৃত হয়েছে। বড় ডেটা বিশ্লেষণ করে নতুন ট্রেন্ড খুঁজে বের করতে এখন সাংবাদিকরা AI-এর শক্তিশালী সহায়তা পাচ্ছেন। তবে AI-চাইলেই সবকিছু পারে না তারও বেশ সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সাংবাদিকতার প্রধান উপাদান মানুষ তবে AI-তে রয়েছে মানবিক আবেগের যথেচ্ছ অভাব, চাকরি হ্রাসের সম্ভাবনা এবং উৎসের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন। তাই প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংবাদিকতার নৈতিকতা বজায় রাখা আজকের শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ও দায়িত্ব। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন আর ভবিষ্যতের প্রযুক্তি নয়–এটি এখনকার বাস্তবতা। সাংবাদিকতায় এর ব্যবহার প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। তবে, AI সাংবাদিকের বিকল্প নয়, বরং এটি এক শক্তিশালী সহকারী।

এতক্ষণ যারা এই নিরস লেখাগুলো পড়েছ তোমাদের জন্য থাকলো ছোট্ট কিছু পরামর্শ : Coursera, edX, Google News Initiative-এর মতো প্ল্যাটফর্ম থেকে AI ও ডেটা জার্নালিজম সংক্রান্ত কোর্স করতে পারো ChatGPT, Bard, Grammarly, Copy.ai ইত্যাদি টুল ব্যবহার করে কনটেন্ট প্র্যাকটিস করতে পারো।

ফ্যাক্ট-চেকিং প্রজেক্টে অংশগ্রহণ বা ইন্টার্নশিপের সুযোগ খোঁজা খুবই জরুরি, ভবিষ্যতে এই স্কিলটার দারুণ চাহিদা থাকবে। সর্বোপরি AI- ব্যবহারে দক্ষতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিন বা নিউজ পোর্টালেই AI ভিত্তিক প্রতিবেদন লিখে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারো। প্রযুক্তি বদলাবে, সাংবাদিকতার রূপ বদলাবে, কিন্তু সাংবাদিকতার মূল নীতিগুলো–সত্যতা, নিরপেক্ষতা ও দায়িত্ববোধ–সর্বদা অটুট থাকবে। AI সেই পথচলায় আমাদের সহযাত্রী হতে পারে, তবে চালকের আসনে থাকবে মানুষই।

ছবি: সংগৃহীত (পরিমার্জিত)

সংগ্রামের ইতিহাস ভুলে না বাংলাদেশ

স্বৈরাচার যা করেছে, আমরা কি তা করব!

ইমরান মাহফুজ
কবি, গবেষক ও সম্পাদক, কালের ধ্বনি

শত বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে অর্জন করি একাত্তরের স্বাধীনতা। সে থেকে শহীদের রক্তে রঞ্জিত আমাদের জাতীয় দিবস ছিল। লক্ষ্য সবার সাম্য; মানবিক মর্যাদা; সামাজিক ন্যায়বিচার পাবে। একাত্তরে রাষ্ট্রভাবনায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেমন ছিল গণতন্ত্র, আবার নব্বইয়ে স্বৈরাচার শাসকের পতনের মূল চেতনাও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই গণতন্ত্র-সামাজিক মর্যাদা নির্বাসিত হয়েছে বলে ২ হাজার প্রাণের ত্যাগে চব্বিশে ঘটেছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান।

বাঙ্গালির জীবনে শ্রেষ্ঠ অর্জন একাত্তরে স্বাধীনতা। তার পটভূমি কেবল একাত্তরে না, দীর্ঘদিনের- অগণিত মানুষের রক্তে। এই অঞ্চল তথা বাংলাদেশ ঘিরে ৩ বার গণ–অভ্যুত্থানের ইতিহাস রচিত হয়েছে। (১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনকে ধরলে ৪ বার গণ–অভ্যুত্থান)। প্রতিবার মানুষের অধিকার প্রশ্নে, পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর বঞ্চিত হবার প্রশ্নে সংগ্রাম ছিল অব্যহত।বৃহত্তর চিন্তায় গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষায়- রক্ত দিই, জেল খাটি, মৃত্যুর মুখোমুখি হই সাধারণরা। আবার মরীচিকার মতো হারিয়ে ফেলি গণতন্ত্র। ঈদের চাঁদের মতো উদিত হয়ে মিলিয়ে যায় আকাশে!

বৃটিশ থেকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক আধিপত্য ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমাদের শতবছরের লড়াই। প্রতিটি লড়াইয়ের আকাঙ্ক্ষা- মানুষের মতো বাঁচা। তারপর যেই ক্ষমতায় আসেন তিনি ভুলে যান- শহীদ আসাদ, শামসুজ্জোহা থেকে নূর হোসেন, ডাক্তার মিলন, রাউফুন বসুনীয়াদের ত্যাগ। বীরশ্রেষ্ঠদের একাত্তর থেকে গণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয় বলে আসে ছাত্রজনতার চব্বিশ জুলাই। বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে সাঈদ মুগ্ধ নামের গণঅভ্যুত্থানের নায়কদের হৃদয়েও ছিল গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিক মর্যাদা। এই নায়কদের ভুলে যাওয়া মানেই 'দেশপ্রেমের' চেতনা থেকে দূরে সরে যাওয়া, একাত্তরকে অস্বীকার করা।

এই লেখা নিয়ে ভাবতেই মাথায় আসে রবীন্দ্রনাথের কথা। যিনি আমাদের মানুষ হিসেবে না দেখে শুধু বাঙালি হিসেবে দেখেছেন। যে বাঙালিকে কবি নিতে পারেননি আস্থায়। ফলে আক্ষেপ করে, হয়তো সে যন্ত্রণা থেকে বলেছেন- 'সাত কোটি বাঙালিরে হে মুগ্ধ জননী রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি'। কারন, কবির দেখা বাঙালি 'মানুষের' চরিত্রের মাঝে নেই। তারা কেবল নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। জনগণের বিশ্বাস ভঙ্গকারী। ইতিহাস ভুলে যাওয়া, মানুষের ত্যাগ ভুলে যাওয়া যাদের স্বভাব। আর এই ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদরা ভুলে গেলেন, গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে বলে- নব্বইয়ের পর চব্বিশের অভ্যুত্থান আসে একাত্তরের স্বপ্ন নিয়ে।

মনে পড়ছে কবি সৈয়দ শামসুল হকের 'আমার পরিচয়' গভীর উপলব্ধির এই কবিতার কথা। এটি কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কবিতার সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, "গাহি সাম্যের গান—যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান। সৈয়দ হকের কবিতায় এসেছে দেশের হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য। শুরুতে হাজার বছরের ইতিহাস স্পর্শ করেছেন, তারপর নদীবেষ্টিত জন্মভূমি, মাতৃভাষার কথা বলেছেন।প্রথম স্তবকের শেষে প্রশ্ন করেছেন "তেরোশত নদী শুধায় আমাকে, 'কোথা থেকে তুমি এলে?" ।কবি জবাব দিয়েছেন নিজেই। প্রজন্মপরম্পরা, শাসকপরম্পরা, ধর্মপরম্পরা, বিপ্লবপরম্পরার কথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলামেরও উত্তরাধিকার সূত্র উল্লেখ করেছেন। ইতিহাস-ঐতিহ্যের বর্ণনায় শেষ পৌঁছেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে। কবি বাঙালির স্বপ্ন এবং লড়াকু চরিত্রের দিকটি উন্মোচন করেছেন। ব্যক্ত করেছেন আশাবাদ এইভাবে, "একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি, আজো একসাথে থাকবোই/সব বিভেদেররেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবোই।" পরের অংশে বলেছেন "এই ইতিহাস ভুলে যাবো আজ, আমি কি তেমন সন্তান?"

আজকের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে- এই ইতিহাস ভুলে যাবো আজ, আমি কি তেমন সন্তান' লাইনটি। আসলেই আমরা ইতিহাস ভুলে যাই, ভুলে গেছি। আবার কোথাও কোথাও ইতিহাস মুছে ফেলে বর্তমান নিয়ে মশগুল থেকেছি। তাতে আমাদের অনেক মাশুল দিতে হয়েছে, হবে। রাজনীতিবিদরা কুতর্কে কাটিয়েছে বছরের পর বছর।স্মরণ করেনি ইতিহাসের সন্তানদের। তাদের কীর্তি পৌঁছে দেয়নি প্রজন্মের কাছে। যা জাতির জন্য লজ্জার বিষয়। আমরাও যদি ইতিহাস ভুলে যাই, তবে আগামী অন্ধকার। ইতিহাস ভুলে যাওয়াকেই ফ্যাসিজম বলে। ত্যাগের ইতিহাস ভুলে গেছে বলে বঙ্গবন্ধু কন্যা থেকে শেখ হাসিনা পরিচিতি পেয়েছে ফ্যাসিস্ট হিসেবে। অথচ স্বৈরাচার এরশাদকে বিদায় দিয়ে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আশা দেখিয়েছে সোনার বাংলা গড়ার। তারপরও আমরা দেখেছি আমাদের শাসকশ্রেণি ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য থেকে সরে এসেছে। ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করেছে সংবিধান। সরে এসেছে সঠিক ইতিহাস থেকেও। অনুসরণ করেছে বাহাত্তর পরবর্তী শেখ মুজিব ও এরশাদকে। বৃটিশ যুগের সংগ্রাম না বললেও লাহোর প্রস্তাব ও দেশভাগের পর আমাদের লড়াই ছিল নিরন্তর।শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দিন আহমেদের সংগ্রাম আমাদের নির্মাণ করে দিয়েছেন আত্মপরিচয়। তাদের প্রেরণা ও সাহসের পথে বাংলার কৃষক লাঙল ফেলে, শ্রমিক কারখানার কাজ ফেলে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। জেলে, তাঁতি, কামার, কুমার সবাই সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্রতিটি সংগ্রামে। সব শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ রূপ নেয় জনযুদ্ধে।আমরা তাদের ভুলতে পারি না। রাজনৈতিকরা ভুলে গেছে কত সহজে। কবি আবুল হাসান স্বাধীন দেশে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশ করেন 'রাজা যায় রাজা আসে' উৎসর্গপত্রে লেখা ছিলো : 'আমার মা/ আমার মাতৃভূমির মতোই অসহায়'। কাব্যগ্রন্থের নামকরণ, উৎসর্গ ও প্রকাশকাল এবং এসব বিবেচনায় নিলে বলা যায়- এই কবি ইতিহাস সচেতন। ফলে আর্থরাজনৈতিক জীবনাভিজ্ঞতায় উচ্চারণ করেন- এই রাজা আসে ওই রাজা যায়/ জামা কাপড়ের রং বদলায়...../ দিন বদলায় না!

কত সহজে কঠিন বিষয় তুলে আনলেন। আমাদের সকল বিষাদ-বিপন্নতা আর নিমগ্নতার ছবি এঁকেছেন। কাগমারী সম্মেলন থেকেই মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের 'আসসালামু আলাইকুম' জানিয়েছিলেন। একটি সাধারণ ধর্মীয় সম্বোধন স্বাধীনতার সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সম্মেলনের মাধ্যমেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীকার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও সচেতন করতে এই সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিল। তারপর ঐতিহাসিক ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর আহ্বান—'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, যার যা কিছু আছে, তা নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।' ঐ আহ্বানে অধিকাংশ মানুষ যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়। বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধের জন্য যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় তাতে অনেক সাধারণ মানুষ অংশ নেয়। বলা যায় সাধারণ মানুষ সবকিছুই করেছে। সেই নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ কিন্তু পুরো সময়টাতেই যুদ্ধের জন্য কাজ করে গেছে। তারপর আমাদের বিজয় এসেছে।

বাস্তবতা হচ্ছে- নির্লজ্জের মতো মুক্তিযুদ্ধে সাধারণের অবদান ও আকাঙ্খাকে এড়িয়ে গেছি। তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছি প্রতিটি নাগরিককে। ফলে সামাজিক মুক্তি আসেনি আজো। প্রসঙ্গে কবি হেলাল হাফিজ লিখেন- স্বাধীনতা সব খেলো, মানুষের দুঃখ খেলো না। আসলেই আমাদের ভাগ্য খুব বেশি বদল হয়নি। স্বাধীনতার ৫৫ বছরে রাজনৈতিকভাবেই সাধারণ মানুষকে প্রান্তিক করে ফেলাটা ক্ষমতাবানদের বড় কর্মে পরিণত হয়েছে।নষ্ট করে দিয়েছে মানুষের সামাজিক মর্যাদাও। মানুষকে তোয়াক্কা না করে আইয়ুব খানও বলতেন, 'প্রথমে উন্নয়ন, পরে গণতন্ত্র'। আইয়ুব খান রাস্তাঘাট, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ অনেক উন্নয়ন করেছিলেন। কিন্তু উন্নয়ন তাঁকে রক্ষা করতে পারেনি।আইয়ুব খানের পতনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের দুই অংশের মানুষ প্রথমবারের মতো একসাথে আন্দোলনে নামে।পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি জাতিগত নিপীড়ন, বঞ্চনা ও বৈষম্য লেগেই ছিল। এক সময় জনগণ সোচ্চার হয়।

"বিপ্লবীর মৃত্যু হয় বিপ্লবের মৃত্যু হয় না"- চে গুয়েভারার একটি চির স্মরণীয় বাণী। ফলে সেই একাত্তরে চেতনায় নব্বইয়ে নূর হোসেনও বলেছেন, 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক।' সে গণ-আন্দোলনে সামরিক জান্তাকে পরাস্ত হয়েছে বটে কিন্তু দেশের রাজনীতিতে স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব বদলায়নি। প্রাথমিকভাবে সে গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র ফিরে পাওয়া, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বাক-ব্যক্তি-সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ভোটাধিকার প্রয়োগ, নিরাপত্তা- এই পাঁচটি বিষয়ের বিজয় নিশ্চিত হয়েছিল, আবার ফিরে দেখি এর একটিও আর অবশিষ্ট নেই। দেখা যায়- নব্বইয়ের আন্দোলনে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের অনেকেই নীতি ও বিশ্বাস পরিবর্তন করেছেন।

ইতিহাস বলে- এমনি করে একাত্তরের পরও যদি দলীয় সরকার না হয়ে একটি জাতীয় সরকার হতো, তাহলে হয়তো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারত। কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে প্রতিনিয়ত জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পদদলিত হয়েছে। বারবার একাত্তরে ব্যর্থ হচ্ছে। স্বৈরতান্ত্রিক যে বিধিবিধান, আইনকানুন সেগুলো দিয়ে মানুষকে ঘরে বসিয়ে রাখা হচ্ছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য চূড়ান্ত হয়েছে বলে তারুণ্য জেগে উঠেছে এবং বলছে- 'বুকের ভিতর দারুণ ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর'। সেই দ্রোহে মানব মুক্তির আশায় বুলেট নিয়েছে বুকে। তারপর অর্জন করি বিজয়, কিন্তু বিজয়কে ধরে রাখতে কতটা ধরে রাখতে পারব? আমাদের ইতিহাস ত ভয়াবহ। আমাদের মাঝে ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেওয়ার প্রবণতা প্রবল। মুক্তিযুদ্ধের যে আদর্শ তা থেকে দূরে সরে যাই বারবার। অস্থিরতা আমাদের গন্তব্যে পৌছতে সাহায্য করে না।

স্মরণ করব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর এই কথাকে- চাইলেই কি আমরা একাত্তরকে ভুলে যেতে পারব? একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের বর্তমানের মধ্যে প্রবহমান। আমাদের দুটো কাজ করতে হবে। অতীতে যে ভালো কাজগুলো ছিল, সেগুলো বিকশিত করতে হবে। অতীতে যে গণতান্ত্রিক উপাদান, ঐক্য, যে সংগ্রামী চেতনা ছিল, তার বিকাশ চাই। আর যে খারাপ দিকগুলো ছিল, সংকীর্ণতা ছিল, পশ্চাৎপদতা ছিল, সেগুলোকে পরিহার করে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করতেই হবে।

সর্বোপরি ফ্যাসিস্ট সরকার যা করেছে, আমরা তা করব না। জুলাই জাগরণে আমাদের মনে প্রাণে জেগে উঠতে হবে- দেশের জন্য সমাজের জন্য। কবির কণ্ঠে বলি- আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে? তোমার ছেলে উঠলে গো মা রাত পোহাবে তবে!

ছবি: সংগৃহীত

দেশের সাংবাদিকতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা

মশিউর রহমান

সাবেক অর্থ সম্পাদক
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি

সাংবাদিকতা হলো সমাজের দর্পণ, যা তথ্য ও সত্যের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। বাংলাদেশের গণমাধ্যম গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। টেলিভিশন, রেডিও, পত্রিকা এবং অনলাইন সংবাদমাধ্যমের প্রসার মানুষের তথ্যপ্রাপ্তি সহজ করেছে। পাশাপাশি, বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক সাংবাদিকতাও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ক্যাম্পাস সাংবাদিকরা শিক্ষার্থীদের সমস্যা, প্রশাসনিক জটিলতা, শিক্ষা-গবেষণার মান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অর্জন দেশ ও দেশের বাইরের মানুষের সামনে তুলে ধরতে কাজ করেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ কর্মকাণ্ড তুলে ধরার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়েও লেখালেখি করেন। এতে শিক্ষার্থীরা লেখালেখির দক্ষতা অর্জন করেন এবং ভবিষ্যতে সাংবাদিকতা পেশায় প্রবেশের পথ সুগম হয়।

তবে দেশের মূলধারার সাংবাদিকতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা উভয়ই নানা চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মূলধারার সাংবাদিকতায় সবচেয়ে বড় বাধা হলো রাজনৈতিক প্রভাব। অনেক সময় সংবাদমাধ্যমগুলো নিরপেক্ষ থাকার পরিবর্তে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে, যা প্রকৃত সত্য জনগণের কাছে পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করে। বিজ্ঞাপন নির্ভরতা আর্থিক সংকট তৈরি করে, ফলে অনেক সময় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে বাধা সৃষ্টি হয়। একইভাবে, সাংবাদিকদের জন্য তথ্যপ্রাপ্তির স্বাধীনতা সবসময় নিশ্চিত করা হয় না, যার ফলে সত্য উন্মোচনে জটিলতা তৈরি হয়।

অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রশাসনিক বাধা, নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি এবং অভিজ্ঞতার অভাব তরুণ সাংবাদিকদের জন্য বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় ক্যাম্পাস সাংবাদিকরা যখন শিক্ষার্থীদের সমস্যা বা প্রশাসনের অনিয়ম নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করেন, তখন তারা চাপের মুখে পড়েন। এমনকি অনেকে হয়রানি বা শাস্তির শিকারও হন। এ ছাড়া অনেক শিক্ষার্থী সাংবাদিকতা পেশায় প্রবেশের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধা পান না, যা তাদের দক্ষতা বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার জন্য কিছু কার্যকর সমাধান গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমত, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে। রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক হস্তক্ষেপ কমিয়ে সাংবাদিকদের নিরপেক্ষভাবে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের জন্য নৈতিকতা, অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরি ও ডিজিটাল নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে উচিত সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে সহায়তা করা এবং গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি করা।

সাংবাদিকতা সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, যা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। তাই দেশের সাংবাদিকতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ও গুণগত মান নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। যদি তরুণ সাংবাদিকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তা দেওয়া যায়, তবে ভবিষ্যতে তারা দেশের জন্য দক্ষ ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যমকর্মী হয়ে উঠবে।

দায়িত্বের নামে আত্মপ্রচার বিপ্লবে এক অন্তঃসারশূন্য দ্বন্দ্ব

সুমাইয়া আক্তার
সাধারণ সম্পাদক
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি

আজকের বাস্তবতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিপ্লব যেন আর জনমানুষের চেতনাভিত্তিক আন্দোলন নয়, বরং ব্যক্তিকেন্দ্রিক এক ধরনের অর্জনে পরিণত হয়েছে।ক্ষমতার প্রতি নির্ভরতা কিংবা লোভ–এই দুই-ই হয়ে উঠছে বিপ্লবের অন্তরায়।যখনই কোনো মানুষ ক্ষমতার আশ্রয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তখনই স্বচ্ছতা ও নৈতিকতা বিলীন হয়ে যায়।সেখান থেকেই শুরু হয় সংকট।

বর্তমান সমাজে সুবিধা পেতে হলে কাউকে 'কেন্দ্র' বানাতে হয়।ফলে মানুষ ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত ক্ষমতা অর্জনকেই জীবনের মূল উদ্দেশ্য মনে করতে থাকে। সুবিধাভোগীদের প্রতি অতিরিক্ত প্রশংসা একধরনের দাসত্ব তৈরি করে, যেখানে তারা ভুলেও ভুলকে ভুল মনে করে না।এমন অন্ধ প্রশংসা আমাদের মানবসেবার মনোভাবকে ধ্বংস করছে।ফলে অনেকেই নিজেদের পদমর্যাদা বৃদ্ধিতে যতটা সচেষ্ট, সমাজ বা মানুষের উন্নয়নে ততটা মনোযোগী নয়।এই বৈষম্য মানুষকে দুর্বল করে তোলে, আর সমাজকে ধীরে ধীরে দুর্বল নেতৃত্বের দিকে ঠেলে দেয়।

ক্ষমতার সামান্য স্বাদ ও ঘ্রাণ পেলেই আমরা 'সাধারণ' থেকে 'অসাধারণ' হওয়ার ইচ্ছায় বুঁদ হয়ে যাই।নিজের মতাদর্শকে 'বিশেষ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই।অথচ 'উচ্চস্তর' বা 'নিম্নস্তর' আসলে আমাদের তৈরি করা এক বিভাজন।নীতিবোধের ক্ষেত্রেও এ বিভাজন স্পষ্ট।ফ্রেডরিখ নিতশের কথাটা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে:
"আপনি যদি একটি তেলাপোকা পিষে মারেন, আপনি নায়ক; কিন্তু আপনি যদি একটি সুন্দর প্রজাপতিকে চূর্ণ করেন, আপনি ভিলেন। নৈতিকতার নান্দনিক মানদণ্ড রয়েছে।'

এই মানদণ্ড আমরা তৈরি করছি কেবল নিজের সুবিধা অনুযায়ী। আমরা পরিবর্তন চাই তখনই, যখন সেই পরিবর্তনে নিজের লাভ আছে। এই অতিরিক্ত 'ভিন্ন' হবার চেষ্টা দুর্বলদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। সুবিধা পাচ্ছে কিছু গুটিকয়েক শ্রেণি, যারা সবসময়ই ক্ষমতার কেন্দ্রে থেকেছে। ফলে বিপ্লব শুধুই বাহ্যিক কাঠামোতে সীমাবদ্ধ থেকে যায়–রাজা বদলায়, শোষণ বদলায় না।নৈতিকতাও এখন নিয়ন্ত্রিত এক ধাঁচে বাঁধা পড়েছে, যা শ্রেণিবৈষম্যকে আরও শক্ত করে তুলছে। সমাজ বলে দেয়, কার সাথে কেমন আচরণ করতে হবে। কিন্তু এই নির্ধারিত আচরণ যে অন্যায় –এটা নতুন করে ভাবতে হবে।

যদি আমরা 'উচ্চস্তর'কে অন্ধ ভক্তি আর 'নিম্নস্তর'কে নিপীড়নের জায়গা থেকে না সরি, তাহলে ভবিষ্যৎ কেবল ক্ষমতার প্রতি মাথা নত করা একরকমের অসার সভ্যতা সৃষ্টি করবে। এই স্বঘোষিত নৈতিকতাই আজ বিপ্লবের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।সত্যিকারের মুক্তি কেবল স্বৈরতন্ত্র থেকে নয়, মুক্তি প্রয়োজন ভেতরের হিংসা-বিদ্বেষ থেকেও। বিপ্লব হতে পারে তখনই, যখন অন্তর ও মস্তিষ্কের পরিশুদ্ধ সংযুক্তি ঘটে।কিন্তু আমরা বরং ক্ষমতার আরাম খুঁজে পাই, এবং জনপ্রিয়তার স্রোতে নিজেকে মিশিয়ে ফেলি।

বিপ্লবের মর্মবোধ আসলে একরকম আত্মজিজ্ঞাসা–নিজেকে বদলানোর শক্তি।শাসক বা শোষকের পতনই যথেষ্ট নয়, চিন্তার জায়গায় যদি পরিবর্তন না আসে, তাহলে বিপ্লব অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। সত্যিকার বিপ্লব আসে তখনই, যখন আমরা বাহ্যিক অসাধারণত্বের মোহ ত্যাগ করি, এবং অন্তর্নিহিত দায়বদ্ধতা থেকে নিজেদের পাল্টাতে শুরু করি।তখন আমাদের আর সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেকে মহান দেখাতে হবে না, 'সুশীল' শব্দ কটাক্ষের নয়, গর্বের মনে হবে। আমাদের আর প্রভাবশালী কারও পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে পরিচয় খুঁজতে হবে না।বরং নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে পারলেই বিপ্লবের বীজ বপন শুরু হবে।

আজ আমরা নিজেরাই এমন চিন্তা গেঁথে ফেলি–যদি প্রভাবশালী কেউ সুপারিশ না করেন, তাহলে পথ চলা কঠিন।কিন্তু এই মনোভাবের পেছনে দায় আমাদের নিজেদেরই, কারণ আমরা নিজেরাই বদলাতে চাই না।আমরা শুধু আশায় থাকি, কেউ এসে সমাজ বদলাবে। কিন্তু নিজেদের পরিবর্তন করতে ব্যাপক অলস। তাও যখন মাঝেমধ্যে দুই একটা শব্দ কেউ তুলে ফেলে আর সাথে অতি প্রশংসনীয় তকমার বিপরীত করলেই তাদের বিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করার পায়তারা শুরু হয়ে যায়। আসলে এটাই সংকট–আমরা গঠনমূলক সমালোচনাকেও ভয় পাই। তখন সভ্যতার স্লোগান হয় শুধুই প্রয়োজন পূরণের বাহানা।

বিপ্লব তখনই হেরে যায়, যখন আত্মউন্নয়নের নামে ক্ষমতার নিজস্ব সংবিধান তৈরি হয়। তখন বিপ্লব হয়ে যায় কেবল এক শ্রেণির ব্যক্তিগত সম্পদ।এসব নির্মূলের বাস্তবায়নে বিবেকের বিচারে চিন্তাশক্তি প্রয়োগে স্ব স্ব মানসিক সমাধানে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে গদ বাঁধা অসাধারণত্তের মূলভাব থেকে নিজেকে বাঁচানো গেলেই হতে পারে আসল বিপ্লব এবং কাঙ্খিত স্বাধীনতা। তাইতো মার্কসবাদ এর প্রায়োগিক প্রবক্তা লেলিন বস্তুগত পরিবর্তনের চেয়ে মনগত পরিবর্তনের উপর জোর দিয়েছেন।

কাজী জাওয়াদ মুর্শীদ

লেখক, গবেষক, গণমাধ্যমকর্মী

ছবি: এআই নির্মিত

ভাবনা কাহারে বলে: গণমাধ্যম উপস্থাপনা ডিসকোর্স

ভূমিকা: একুশ শতকের দিনগুলো আর চব্বিশ ঘন্টায় সীমাবদ্ধ নাই।ইহার লাগাম ক্রমেই মিনিটের ঘর ছাড়াইয়া সেকেন্ডের কাঁট ছুঁইয়াছে। আর সেইখানেই হইয়াছে বিপত্তি। অধুনা সমাজ মাধ্যমের "রিলস" পণ্যটি যাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সংবাদ নামক ভারি বিষয়টিও বর্তমানে তথ্যের গণ্ডি পার করিয়া পণ্য হিসাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ফলস্বরূপ অধুনা প্রতিটি সংবাদ মাধ্যমেই দেখিবেন একসময়ের নামিদামি "প্রিন্ট মিডিয়া" গুলো বর্তমানে ডিজিটাল প্লাটফর্ম নামক দর্শন বাণিজ্যের ইঁদুরদৌড়ে লিপ্ত। তবে সংবাদ নামক বিষয়টিকে আধুনিক বা সনাতনি যেভাবেই বাজারজাত করুন না কেন, সেখানে উপস্থাপন কৌশল খুবই গুরুত্ব বহন করে।হলফ করিয়া বলিতে পারি পৃথিবীর গতি যতই লাগাম ছাড়া হউক, মানুষ ব্যতীত কোন ধরনের বাণিজ্যই চলে না। কারণ, বাণিজ্য নামক বিষয়টি মানুষ দ্বারা পরিচালিত একটি বিশেষ ব্যবস্থা যেখানে হরহামেশাই মানুষকে বোকা বানানোর প্রয়াশ বিদ্যমান। বক্ষমান নিবন্ধে সাধারণ দর্শকগণকে বোকা বানানোর নিমিত্ত সংবাদ মাধ্যমের উৎকৃষ্টমানের একটি হাতিয়ার নিয়া আলোচনার চেষ্টা করা হইবে। যাহার নাম উপস্থাপনা।

গণমাধ্যমকর্মী হিসেবে আমার যাত্রা: নাটক বিষয়ে অধ্যায়ন করিয়া একজন গণমাধ্যমকর্মী হিসেবে আমার পথচলা খবু একটা স্বপ্রণোদিত কিংবা আহ্লাদের না থাকিলেও অর্থনীতির দুষ্টচক্রে পিষ্ট হইতে অন্নের সন্ধানেই এই পথে যাত্রা শুরু।তবে প্রথমে খানিকটা মেনে নিলেও বর্তমানে এই পথচলাকে মেনে নিতে এবং মনে নিতে বাধ্য হইয়াছি।তবে দীর্ঘ ছয় বছর এই পথের পথিক হিসাবে বুঝিয়া গিয়াছি এইখানে কখনো কখনো আনন্দ থাকিলেও উপভোগ নাই। আবার উপভোগ থাকিলেও আনন্দ নাই। এইখানে জানাইয়া রাখা উত্তম হইবে যে, আমার এই যাত্রটি একজন "রিপোর্টার" হিসেবে শুরু হইয়াছিলো। তবে কয়েক বছরের পথ পরিভ্রমণে সেই পদবির শ্রী বৃদ্ধি পাইয়া বার্তাকক্ষ-সম্পাদক ও উপস্থাপকের আসনটি অলংকরণ করিয়াছে। তবে নিবন্ধের বিষয় যখন উপস্থাপনা তখন বাকি সব পরিহার করিয়া সরাসরি উপস্থাপনার গলা চায়িা ধরাই উত্তম।সেই দিকে আলোকপাত করিবার পূর্বে করজোড়ে জানাইয়া রাখিতে চাই উপস্থাপনার খুঁটিনাটি জানিয়া যাহারা নিজেদের মুখগুলের শ্রী দেখাইবার পাশাপাশি পরিচিতি বাড়াইবার নিমিত্ত এই নিবন্ধে চোখ রাখিবেন, লিঙ্গভেদে তাহারা আমাকে গালাগাল করিলে আমি মোটেই অখুশি হইবো না। কারণ নিবন্ধটি পড়িবামাত্র আপনাদিগের মানসপটে কবিগুরুর বিখ্যাত "সখি ভাবনা কাহারে বলে" গানটির একটি বিশেষ চরণ গাঁথিয়া দেব। চরণটি এরূপ "সখি ভালোবাসা কারে কয়? সে কি কেবলি যাতনাময়?" গান বাজনা সময় মতোই হইবে বোধকরি এবার উপস্থাপনা নিয়ে কিছু পদ উপস্থাপন করাই উত্তম।

উপস্থাপনা: মোটাদাগে বলিতে গেলে শ্রোতার নিকট বক্তার তথ্য পৌঁছাইয়া দিবার কর্মটিই উপস্থাপনা। এবার আসুন, বক্তা এখানে কোন কর্মটি করিতেছে, কেন করিতেছে, কোন মাধ্যমে করিতেছে? কাহার জন্য করিতেছে? খুবই সহজ, বক্তা অর্থের জন্য দর্শন বা শ্রবণ মাধ্যমে তথ্য বা উপাত্ত শ্রোতার নিকট পৌঁছাইয়া দিতেছে।এবার প্রশ্ন আসে শ্রোতা কে? এর উত্তরও খুব কঠিন নয়। শ্রোতা হইলেন ভোক্তা। সংবাদমাধ্যমের মালিকপক্ষ বা সম্পাদকগণ যখন কোন সরকারের পতন হইবার সঙ্গে সঙ্গে গা ঢাকা দেন তখনই আমার লেখায় সংবাদ মাধ্যমকে বাণিজ্যের উপাদান তুলিয়া ধরিবার বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া যায়। আর সংবাদ মাধ্যম বাণিজ্যের বিষয় কেনইবা হইবেনা, যে দেশের মানুষ বই না পড়িয়া লেখকের খ্যাতির পৃষ্ঠায় চোখ রাখে, সে দেশে সংবাদ শুধু পণ্যই নহে বরং আর্কষণীয় হেডলাইনসহযোগ খাওয়ার জিনিসও বটে। বাণিজ্যে ভোক্তা এবং বিক্রেতার অম্লমধুর সম্পর্কের কথা সকলের জানা। তাহলে একটি সংবাদমাধ্যমের উপস্থাপক হিসাবে যিনি থাকিবেন তাহার গ্রহণযোগ্যতা যে ভোক্তার নিকট আসমানের তারকাসম হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। বিপত্তি এইখানেই। কারণটা জানিলে পাঠকের চক্ষু চড়কগাছ হইবার উপক্রম হইবে।

বঙ্গদেশে তথা প্রাচ্যদেশের নন্দন ভাবনায় ললিত করার স্রষ্টা পুরুষ হইলেও, তাহা পরিবেশনের মাধ্যম নারী। এখানে Screen Politics তথা উপস্থাপন

রাজনীতি কাজ করে। ইহা এতাটাই ভয়াবহ যে এর ফলে কোনো অনুষ্ঠানের গুণগতমানের জানাজায় স্বয়ং মালিকপক্ষ ইমামতি করিয়া থাকেন। নিউজ প্রেজেন্টার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের তথ্য অনুযায়ী, দেশের সংবাদ মাধ্যমে পুরুষ উপস্থাপক শতকরা ২৫ ভাগ, বিপরীত পর্দায় নারী উপস্থাপকের হার শতকরা ৭৫ ভাগ।কী বলিয়াছিলাম, চক্ষু চড়কগাছে উঠিবে।চড়কের মগডালে না উঠিলেও নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে পাঠকের চক্ষু গাছ বাওয়া শুরু করিয়াছে। থামুন, গাছে যখন উঠিবেন ধীরে সুস্থে ওঠাই ভালো।নতুবা অসাবধানতাবসত কোমর ভাঙিতে পারে। উপস্থাপক পর্দা বাণিজ্যের অন্যতম মাধ্যম কিন্তু তাহার বাজার মূল্য কীরূপ? এই আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে জানিয়া রাখা উত্তম যে, সংবাদ উৎপাদনের কারখানাগুলো মাইকেল মধুসূদন বাবুর আধুনিকতাকে আষ্টেপিষ্টে রপ্ত করিয়া এক ধাপ আগাইয়া গিয়াছে। এই সকল কারখানায় দশভূজা এবং দশানন উভয়েরই কদর রইয়াছে। তবে কারখানাগুলির মালিকগণ লক্ষ্মী সরস্বতীর দ্বন্দটি ঘোঁচাতে ইচ্ছুক নন। যেখানে দুই বোন নিজেরাই নারায়ণকে লইয়া ভাগাভাগিতে ব্যস্ত সেইখানে এই অপ্রয়োজনীয় ঝামেলায় মালিকপক্ষই বা কেন জড়াইতে যাইবেন। কাজেই উপস্থাপক নামক বিশেষণটিকে পেশা হিসাবে বাছিয়া লইবার পূর্বে জেনে রাখিবেন এই পেশায় অবতীর্ণ হইলে আসমানের চন্দ্র হয়তো হইতে পারিবেন তবে চন্দ্রচূড় হইতে পারিবেন না। আরও জানাইয়া রাখিতে চাই একই গগনে বেশি দিন আলে ছড়াইবেন এমন আশা না করাই উত্তম। এখন গুনগত বিষয়টি ওপর দৃষ্টি দেয়া যাক।দেশের অগণিত সংবাদ মাধ্যমের পর্দায় আমার ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত এমন অনেক উপস্থাপক রইয়াছেন যাহার বাংলা কম্পনজাত ধ্বনি "র" এবং তাড়নজাত ধ্বনি "ড়"-এর উচ্চারণ সঠিকভাবে করিতে পারেন না। অবশ্য করিতে প্যারেন না বলাটা কিঞ্চিৎ ভুলই হইবে। তাহারা হয়তো জানেনই না। আবার "ষ" "স" এবং "শ"-এর উচ্চরণ আকেই স্বরস্থান থেকে করিয়া থাকেন। কেউ কেউ আবার "পহেলা" শব্দটির উচ্চারণ যে "পয়লা"-তাহাই জাননেনা। আবার ইদানিং তো তারিখ হিসাবে "পহেলা", "দসোরা" এর স্থলে ১,২ পড়িয়া অতি আধুনিক হইবার প্রয়াশ চালনা করিয়া থাকেন। আবার বাংলা সংবাদ পড়িতে বসিয়া অনেকেই "পুলিশ" শব্দটিকে ইংরেজি Sh উচ্চারণ করিয়া থাকেন। বাংলায় যাহার উচ্চারণ "স" এর সদৃশ অর্থাৎ "পুলিস"। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন বাংলা ভাষা উচ্চারণ নির্ভর। তাহলে এখন প্রশ্ন যাহারা হরহামেশায় এরূপ ভুল করিয়া থাকেন তাদেরই চন্দ্রমুখটিই কেন হরহামেশা বাক্সবন্দি হয়? কারণটি হলো তাহাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাটি অধিক উত্তম।সঙ্গে তারা ইশ্বর প্রদত্ত চন্দ্রবদনের অধিকারী। এরসঙ্গে আরও একটি দিক রইয়াছে যদিও তাহা সত্য হলেও শ্রবণে কিঞ্চিত কটু।এক্ষেত্রে উপস্থাপক নামক পণ্যটিকে ভোক্তা পছন্দ করিয়া থাকেন।এবার হিসাব-নিকাশের পালা।দেশের সমাজব্যবস্থায় সর্বদাই পুরুষকে ভোক্তা হিসাবে বিবেচনা করা হইয়া থাকে এবং একজন পুরুষই বাজারে যাইয়া পয়সা খরচ করিয়া থাকেন। মাথাটা ঠাণ্ডা করিয়া এবার ভাবুন আপনার বৈঠকখানার বোকা পর্দায় যখন "টক শো" সম্প্রচার হইয়া থাকে তখন কিসের বিজ্ঞাপন দেখিয়া থাকেন? রড, সিমেন্টের কোম্পানির বিজ্ঞাপন।আর পর্দায় যখন নাটক সিনেমার রাজত্ব তখন বিরতির মাঝখানে দেখা মেলে, সাবান, চিনি, আটা, ময়দা, সুজি বা ডায়াপারের মতো পণ্যের। কারণটা হলো "টক শো"-এর ভোক্তা একজন পুরুষ এবং তাহার মানসপট লৌহ কঠিন, তিনি নির্মাতা। অপরদিকে নাটক সিনেমার ভোক্তা নারী। তাহার কোমল হৃদয়ের মানসপটে কেবলই সংসার সামলানোর চিন্তা উকি দিয়া থাকে।সংবাদ নামক পন্যটির ভোক্তার পাল্লায় যেহেতু পুরুষের মান ভারি সেহেতু "ইদিপাস কমপ্লেক্স"-এর সূত্র মতে, একজন পুরুষ একজন নারীকে দেখিতেই পছন্দ করিবেন।পর্দায় তাই নারীর আগমনই অধিক। সেই নারীর "বই পড়া"-কে "বই পরা" বলে উপস্থাপন করিলেও ভোক্তা পুরুষের নিকট তাহা অমৃতসম।পুরুষ পাঠকগণ ভাবিছেন, "কেন পাগলের লেখা পড়িতে বসিলাম।" স্থির হন ভ্রাতাসকল। চটকদার খবর আছে। নারী উপস্থিপকের উপস্থিতি অধিক হইলেও পুরুষ উপস্থাপকের পরিচিতির পাল্লা ভারি। এই স্থানেও সেই চিরচেনা অর্থনীতির সূত্র "জোগান যাহার কম, চাহিদা তাহার বেশি।" তবে খেয়াল করিলে দেখিবেন উপমহাদেশে দূরদর্শনের পর্দায় যতো পুরুষ উপস্থাপক হাজির হন তাহার সিংহভাগই শশ্রুমণ্ডিত এবং তাহার প্রয়োজনের অধিক রূপসজ্জা সামগ্রী ব্যবহার করিয়া থাকেন। আসলে করিয়া থাকেন নয়, করানো হইয়া থাকে। কারণ তাহার লালিত্ব দেখিতেই দর্শক আসিবে। আবার সংবাদ শেষে দর্শকই বলিবে, নারীসুলভ রূপসজ্জা হইয়াছে। এবং যেহেতু এই পেশায় খ্যাতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ট্যাক ভরে না, তাই লক্ষ করিয়া দেখিবেন, পর্দায় পুরুষের আগমন বেশি ঘটে সাপ্তাহিক ছুটিতে, কাকডাকা প্রাতে নতুবা গভীর রজনীতে। উহার কারণ উপস্থাপনাকে পেশা করিলে পুরুষের সংসারের ঘানিতে জোর হয় না। তাই পুরুষ ইহাকে নেশা বানাইয়া নিয়াছে। তাই হলফ করিয়া বলিতে পারি সংখ্যালঘু হইলেও এই পেশায় পুরুষের তারকাখ্যাতি নারীর চাইতে অধিক। কারণ পর্দা রাজনীতিতে নারী অনেক কারণে "হাইব্রিড পলিটিশিয়ান"-এর ভূমিকায় থাকিলেও পুরুষকে তৃণমূল হইতে উঠিয়া আসিতে হয়।ফলস্বরূপ একজন পুরুষ উপস্থাপক অধিক খাঁটি হইতে পারেন।ভগিনীগণ আপনারা অনর্থক রাগিবেন না। আপনারা ইশ্বরের সুন্দরতম সৃষ্টি।তবে কষ্টের বিষয় আপনাদিগকে পুঁজি করিয়া বণিকশ্রেণি বাণিজ্য প্রসার করিতেছে, যাহা আপনারাই অনেকাংশে বুঝিতে পারেননা। নিশ্চয়ই আমার ভগিনীগণের মধ্যে এমন অনেক আছেন যাহারা বুদ্ধিমত্তায় যে কোন পুরুষের কর্ণকর্তন করিতে পারিবে। সর্বশেষ বলিতে চাই পর্দার রাজনীতি দুই প্রকার একটি দর্শক তথা ভোক্তাকে বোকা বানাইয়া আকৃষ্ট করার। অপরটি দুরদর্শনে তথা মিডিয়ায় কর্মরত মানুষের অন্তঃরাজনীতি। যেহেতু মিডিয়াতে চেহারা দেখাইবার সুযোগ আছে, আর চেহারা দেখাইলে খ্যাতি মেলে, তাই এই রাজনীতির থাবাটি ভয়ংকর। এই জন্যই শুরুতে বলিয়াছিলাম, "নারায়ণ প্রাপ্তিতে স্বয়ং লক্ষ্মী-সরস্বতী অন্তকোন্দলে লিপ্ত।

মিনতিঃ বলিবার আরো অনেক ছিলো তবে শব্দের পায়ে শেকল বাঁধা অগত্যা তাই শেষ করিতে হইবে। আমার এই নিবন্ধ পড়িয়া অনেকেই ভাবিতে পারেন, "এতো কড়া কথা না বলিয়া চাকুরি ছাড়িলেই হয়।" সেইসব পাঠকের উদ্দেশে স্বশ্রদ্ধ সালাম জানাইয়া বলিতে চাই, "পথে যখন নামিয়াছি যাত্রার শেষ দেখিতে চাই।' তাছাড়া আমি বিশ্বাস করি পরিবর্তন আসিবেই। প্রয়োজন সচেতনভাবে আত্মউন্নয়ন। আর সর্বোপরি পেশা নির্বাচনের অধিকারটি সাংবিধানিক, তবে যাহারা সংবাদ উপস্থাপক হইতে চান তাহাদের অবশ্যই অন্যান্য পেশাজীবীগণের চাইতে সকল দিক হইতেই নিজেকে বিশেষভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ছবি: সংগৃহীত

সংবাদের ভাষা: রূপান্তরের ধারায় সত্যের সন্ধান

পলাশ মাহমুদ
অনলাইন এডিটর, দৈনিক কালবেলা

ভাষা কেবল ভাব প্রকাশের মাধ্যম নয়, এটি চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তবতার একটি কাঠামো। সাংবাদিকতার জগতে ভাষা আরও অনেক বেশি কিছু। এটি সত্যের বাহক, প্রশ্নের ধারালো অস্ত্র এবং জনগণের কাছে সত্য প্রকাশের মাধ্যম। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষার ধরন, ব্যবহার এবং উদ্দেশ্যও বদলেছে। আজকের সংবাদ মাধ্যমের ভাষা কি আগের মতোই দায়বদ্ধ, বস্তুনিষ্ঠ ও শক্তিশালী? নাকি তা হয়ে উঠেছে সুবিধাবাদী, সংবেদনশীলতার খাঁচায় আবদ্ধ এক চলতি ধারার উপস্থাপন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আমাদের ফিরে তাকাতে হয় সংবাদ ভাষার রূপান্তরের ধারায় যেখানে প্রযুক্তি, বাজার, রাজনীতি ও সমাজ একসঙ্গে ভাষাকে বদলে দিয়েছে।

সংবাদের ভাষার প্রারম্ভিক রূপ: সত্যের কাঠামো

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে দেখা যায়, স্বাধীনতা-পূর্ব এবং পরবর্তী সময়ের সংবাদ ছিল অনেক বেশি তথ্যনির্ভর, কাঠামোগত ও আদর্শিক। সাংবাদিকরা তথ্য সংগ্রহে ছিলেন নিষ্ঠাবান এবং ভাষায় ছিল ভারসাম্য ও গাম্ভীর্য। 'দৈনিক ইত্তেফাক', 'সংবাদ', 'বাংলার বাণী' কিংবা পরবর্তীকালে 'প্রথম আলো', 'সমকাল'-এর মতো পত্রিকাগুলোর প্রারম্ভিক সংখ্যাগুলোতে দেখা যায় সংবাদের ভাষা ছিল গদ্যরীতিতে, প্রাঞ্জল অথচ শক্তিশালী।এ সময় সংবাদ লেখার পদ্ধতিতে 'হার্ড নিউজ' ছিল প্রাধান্যপ্রাপ্ত, যেখানে 'কে, কী, কোথায়, কবে, কেন এবং কীভাবে' (5W+1H) অনুসরণ করে তথ্য উপস্থাপন করা হতো। ভাষা ছিল সংযত ও বস্তুনিষ্ঠ, শিরোনাম ছিল সরল ও ব্যাখ্যামূলক।

রূপান্তরের সূচনা: প্রযুক্তি ও বাণিজ্যিকতার প্রভাব

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে গণমাধ্যমের ভাষায় এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয় বাণিজ্যিক চাপ ও পাঠকের চাহিদার প্রতি অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া। টেলিভিশন সাংবাদিকতার উত্থানের পর দৃশ্যমানতা ও নাটকীয়তার চাহিদা বাড়ে।এরপর ডিজিটাল মিডিয়ার যুগে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদের ভাষা হয়ে পড়ে আরও সংক্ষিপ্ত, দ্রুত এবং 'আকর্ষণীয়'।'ক্লিকবেইট' শিরোনাম, অতিনাটকীয় ভাষা এবং মাঝে মাঝে বিভ্রান্তিকর বাক্য নির্মাণ এসবই ভাষার মধ্য দিয়ে পাঠকের মনোযোগ কেড়ে নেয়ার প্রচেষ্টা।

সমকালীন ভাষার সংকট: দায়বদ্ধতা না জনপ্রিয়তা?

বর্তমানে অনেক সংবাদ মাধ্যমই ভাষার দায়বদ্ধতা নয়, বরং তার 'ভাইরাল' হওয়ার সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দেয়।অনেক সংবাদে দেখা যায় ভাষার কাঠামো নষ্ট হচ্ছে বানান ভুল, শব্দচয়নে অসংলগ্নতা, এমনকি ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি অবমাননাকর উপস্থাপন। এতে সংবাদপাঠে এক ধরনের অস্থিরতা ও তথ্য-ভ্রান্তি তৈরি হয়।এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠে ভাষা কি এখন আর সত্যকে বহন করছে, নাকি শুধু পাঠক আকৃষ্ট করার অস্ত্র হয়ে উঠেছে?

বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্র সাংবাদিকতা: ভাষার নির্মাণে নতুন দিগন্ত

বিশ্ববিদ্যালয় হল মত, মানস ও মননের চর্চার ক্ষেত্র।এখানে সাংবাদিকতা চর্চা কেবল তথ্য প্রচারের নয়, বরং ভাষার সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল ব্যবহার শেখার জায়গাও।ছাত্র সাংবাদিকরা যেহেতু সমাজের সচেতন নাগরিক এবং ভবিষ্যতের সংবাদকর্মী, তাই তাদের ভাষা সচেতনতা, বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপন এবং দায়বদ্ধতার চর্চা খুব গুরুত্বপূর্ণ।তারা যদি শিখে কীভাবে একটি সংবাদ গঠন করতে হয়, কীভাবে শব্দ বেছে নিতে হয়, কীভাবে মতামতের সঙ্গে তথ্যের ভারসাম্য বজায় রাখতে হয় তবে ভবিষ্যতে একটি দায়িত্বশীল গণমাধ্যম সংস্কৃতি গড়ে উঠবে।

এআই ও ভাষার ভবিষ্যৎ: নতুন চ্যালেঞ্জ

বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) যেভাবে সংবাদ লেখা, সম্পাদনা এবং অনুবাদে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাতে ভাষার মৌলিকতা ও মানবিক সংবেদনশীলতা নিয়ে নতুন প্রশ্ন উঠছে।ChatGPT বা Google Translate-এর মতো টুল দিয়ে লেখা খবরের মধ্যে অনেক সময়েই দেখা যায় যান্ত্রিকতা, প্রাসঙ্গিক শব্দ বাছাইয়ের অভাব এবং ভাষার আবেগহীনতা।

উপসংহার: ভাষা হোক সত্যের বাহক

ভাষা বদলাবে এটাই স্বাভাবিক।কিন্তু ভাষার মূল উদ্দেশ্য যেন বদলে না যায় ।সাংবাদিকতার ভাষা যতই সংক্ষিপ্ত বা প্রযুক্তিনির্ভর হোক না কেন, তা হতে হবে তথ্যভিত্তিক, দায়িত্বশীল ও নৈতিক মানসম্পন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সাংবাদিকরা এই পরিবর্তনের ধারায় নিজেদের ভাষাকে যেমন সাবলীল করবেন, তেমনি তার মাধ্যমে গড়ে তুলবেন এক দৃঢ় মূল্যবোধের ভিত্তি। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি হোক সেই চর্চার এক শক্ত ভিত, যেখানে শব্দের মাধ্যমে সত্যের সন্ধান চলবে নিরন্তর।

ছবি: ঢাকা ট্রিবিউন

ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের হতাশ করেছে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ

মোহাম্মদ আজহার

সভাপতি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি

দেশের প্রায় সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একটি অংশ পড়াশোনার পাশাপাশি ক্যাম্পাসে সাংবাদিকতা চর্চা করেন। এসব শিক্ষার্থীরা নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো সংবাদ সংগ্রহ কিংবা সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যয় করে থাকেন। যে সময়ে তারা অনায়াসে একাধিক টিউশন করে সেখান থেকে উপার্জিত টাকায় খুব সহজেই নিজেদের দৈনন্দিনের খরচ মেটাতে পারতেন। কিন্তু এর পরিবর্তে দেশপ্রেম ও দায়বদ্ধতা থেকে ছাত্রজীবনেই সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত হওয়ার পথ বেছে নেন অনেকে। এসব শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই প্রথমে গল্প, কবিতা, কলাম ইত্যাদি লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ধীরে ধীরে তারা লেখালেখির পথচলাকে পূর্ণতা দিতে সাংবাদিকতায় আসেন।

অনেক আগ্রহ, উদ্দীপনা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সাংবাদিকতায় এলেও মিডিয়া হাউজগুলোর আসল রূপ দেখতে তাদের সময় লাগে মাত্র কয়েকমাস। ঝকঝকে ফকফকে টিভির পর্দার ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা হয়ে যায় এখানে। অঙ্কুরেই ম্লান হতে থাকে শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন।কারণ অধিকাংশ মিডিয়াই ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের কামলার মতো খাটালেও ন্যূনতম বেতন-ভাতা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। তাছাড়া বেশিরভাগ মিডিয়া হাউজের লোকজন মফস্বলে কর্মরত সাংবাদিকদের মতোই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গেও অমানবিক ও অপেশাদার আচরণ করতে কার্পণ্য করেন না। বছরের পর বছর শিক্ষার্থীদের খাটানো হয় বিনাবেতনে। যার ফলে অনেক সম্ভাবনাময়ী ক্যাম্পাসে কর্মরত সাংবাদিকদের পরবর্তীতে মিডিয়া পাড়া ছাড়তে দেখা যায়।

মিডিয়া হাউজগুলোর এহেন আচরণের দরুন মফস্বলের গণমাধ্যমকর্মীরাও সাংবাদিকতার নামে চাঁদাবাজির পথ বেছে নেয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এখনো শিক্ষার্থীরা সাংবাদিকতাকে তুলনামূলক নিষ্কলুষ রেখেছে বলা যায়। কিন্তু হাউজগুলোর ক্রমান্বয়ে অপেশাদার ও দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ অচিরেই ক্যাম্পাসে কর্মরত সাংবাদিকদেরও অন্যায়-অপরাধে জড়িত হওয়ার দিকে ধাবিত করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে।এর দায় ব্যাঙের ছাতার মতো মোড়ে মোড়ে পত্রিকা হাউজ খুলে বসা মিডিয়াগুলোকেই নিতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের মাধ্যমে বিষয়গুলো সমাধানের চেষ্টা করছে।কমিশনও অংশিজনদের মতামত নিয়ে ইতিমধ্যে অনেকগুলো সুপারিশ করেছে। যেখানে অধিকাংশ বিষয় উঠে আসলেও ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের ওয়েজবোর্ডে যুক্ত করার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট বেতন-ভাতা নির্ধারণের বিষয়ে আমরা কোনো সুপারিশ দেখিনি। বিষয়টি সংস্কার কমিশন জ্ঞাতসারেই এড়িয়ে গেছে বলে মনে করি। যা নিয়ে পরবর্তীতে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনাও সৃষ্টি হয়। এটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের সকল ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের হতাশ করেছে। অথচ এই ক্যাম্পাস সাংবাদিকরাই আগামী দিনে দেশের গণমাধ্যমকে নেতৃত্ব দেবে। আশাকরি সুপারিশ কার্যকরের সময় বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা করা হবে।

সর্বোপরি যেসব মিডিয়া ক্যাম্পাসে কর্মরত সাংবাদিকদের পর্যাপ্ত বেতন-ভাতা দিতে অপারগ, তাদের ক্যাম্পাসে প্রতিনিধি না দেওয়া উচিৎ। আর দিয়ে থাকলেও ইতিপূর্বে কর্মরত প্রতিনিধিদের অতীতের সকল পারিশ্রমিক পরিশোধ করতে বাধ্য করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন।

কেবল আশ্বাসে নয়, সময় এসেছে পরিবর্তনের।মূলা ঝুলিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের সুযোগ যেন আর কোনো মিডিয়া বা ব্যুরো প্রধান না পায়, এ ব্যাপারেও আমাদের সোচ্চার হতে হবে।আমাদের কলমটা যেমন অন্যরা বৈষম্যের শিকার হলে চলমান থাকে, তেমনি নিজেদের সামগ্রিক স্বার্থেও যেন প্রতিনিয়ত কালি ঝরায়।

ড. আবদুল্লাহ হারুন চৌধুরী

অধ্যাপক, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিসিপ্লিন,
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

ছবি: ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

জীব বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি পৃথিবীই আমাদের স্বপ্ন

জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব

মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীববৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য সেবার মতো অনেকগুলি মৌলিক বিষয়ে আমরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে জীববৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল। সাধারণত জীববৈচিত্র্যের গুরুত কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

ক) অর্থনৈতিক গুরুত্ব: একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাই, আমাদের খাদ্য সামগ্রী থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনধারনের অধিকাংশ উপকরণ আসছে জীব জগৎ থেকে। আর আমাদের প্রয়োজন, রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী আমরা ব্যবহার করঠি জীববৈচিত্র্যকে। জীববৈচিত্র্য আছে বলেই রয়েছে আমাদের রুচির ও কৃষ্টির বৈচিত্র্য। সভ্যতার প্রথম প্রহর থেকেই মানুষ এবং গৃহপালিত পশু-পাখির চিকিৎসার যোগান দিয়ে আসছে এই বিচিত্র্য জীবজগৎ। আজকের ঔষধ শিল্পের উৎপাদিন ঔষুধের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগের কাঁচামাল হচ্ছে উদ্ভিদ ও প্রাণী। খাদ্য, ভেষজ ছাড়াও সভ্যতার বাহন কাগজসহ অনেক শিল্পের কাচামালের যোগ দিচ্ছে এ জীবজগৎ। নান্দনিক সৌন্দর্য্য সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য আমাদের চিত্তবিনোদন ও আনন্দের খোরাক জুগিয়ে আসছে।

খ) বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: প্রতিটি নির্দিষ্ট প্রতিবেশ বিরাজমান একক জীব বা জীবসম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যে এবং অবস্থিত পরিবেশের অ-জীব উপাদানসমূহের মধ্যে একটি আন্তঃ প্রক্রিয়া বিরাজমান, যা বিভিন্ন প্রাকৃতিক চক্রের ভারসাম্য রক্ষা করছে।পরিবেশ ও প্রতিবেশ পরিবর্তনের ক্রিয়াকলাপ জানার মাধ্যমে আমরা অনেক রহস্য উদঘাটন করতে পারি, যা আজও আমাদের অজানা। অনেক প্রজাতির অর্থনৈতিক গুরুত্ব আজও অজানা রয়ে গেছে। আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহৃত তালিকায় যে সব উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে তার সবগুলোই বন্য অবস্থা থেকে আবাদ ও পোষ্য অবস্থায় আনা হয়েছে। প্রতিটি আবাদী উদ্ভিদ ও পোষ্য প্রাণীর সাথে সম্পর্কিত প্রজাতিসমূহ বন্য অবস্থায় প্রকৃতিতে বিরাজমান। আবাদী ফসল ও পোষাপ্রাণীর উন্নয়নে বন্য অবস্থায় বিরাজমান তাদের নিকট আত্মীয় প্রজাতি থেকে "জিন" বা বংশগতির বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যবহার করা হয়। 'জিন' সংযোজনের মাধ্যমেই জৈব প্রযুক্তিতে 'জেনেটিকেলি মডিফাইড অরগানিজম' উদ্ভাবন করা হচ্ছে।

গ) নৈতিক গুরুত্ব: প্রতিটি জীব ও জীবসমৃদ্ধ পরিবেশ ব্যবস্থার রয়েছে বিশেষ নান্দনিক সৌন্দর্য্য। জীব জগৎ ও তার বৈচিত্র্যকে আমরা যেমন ব্যবহার করছি, পরবর্তী প্রজন্মেরও রয়েছে এটাকে ভোগ করার সমান অধিকার।সুতরাং আমাদের এই জীববৈচিত্র্য পরবর্তী বংশধরের জন্য রেখে যাওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

জীববৈচিত্র্য ধ্বংস এবং জীববৈচিত্র্যের প্রতি হুমকিসমূহ

বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ, অবিবেচনা প্রসূত সম্পদের আহরণ, কৃষিভূমির সম্প্রসারণ, বনভূমির সংকোচন, অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ড, অধিক ফলনশীল শস্য উৎপাদনের জন্য পরিবেশের সাথে ভারসাম্যহীন প্রযুক্তি তথা রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগ, লোকজ ঐতিহ্যের বিলুপ্তি, পরিবেশের বিরূপ পরিবর্তন অর্থাৎ এসবের একক এবং সামগ্রিক প্রভাবে অনেক প্রজাতি ভূপৃষ্ঠ থেকে বিলীন হয়ে গেছে।লোপ পাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। আর যেটুকু আছে, তাও আবার হুমকির সম্মুখীন। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস ও তার হুমকির কারণসমূহকে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি:

(ক) প্রতিবেশ অবস্থান বা আবাসস্থল ধ্বংস: প্রতিটি প্রজাতির টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন তার বাসোপযোগী নিবিড় প্রতিবেশ ও আবাসস্থল।কিন্তু মানুষ বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রতিবেশ অবস্থান বা প্রজাতির আবাসস্থলের পরিবর্তন সাধন করছে। যেমন: বনভূমি বা চরণভূমিকে কৃষিভূমিতে

রূপান্তর, অপরিকল্পিতভাবে বাঁধ নির্মাণ, নিষ্কাশণ খাল খনন বা মাটি ভরাট করে জলাভূমিকে কৃষিভূমি বা আবাসিক এলাকায় রূপান্তর।এসব কারণে আবাসস্থল হচ্ছে বিপন্ন। ফলশ্রুতিতে অনেক প্রজাতি নির্দিষ্ট এলাকা, এমনকি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।এক সময় আমাদের দেশের বনাঞ্চলে গন্ডার দেখা যেত। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে গন্ডার চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। গ্রাম এলাকার বনেও ছিল বিভিন্ন জীব-জন্তু। কিন্তু আবাসস্থল ধ্বংস হওয়ায় আজ এদের অনেকেই বিলুপ্ত, বিপন্ন বা হুমকির সম্মুখীন।

(খ) বিদেশী আগ্রাসী প্রজাতি: ঘটনাক্রমে বা মানুষের ইচ্ছায় অনেক সময় এক ভৌগলিক জীব এলাকার উদ্ভিদ বা প্রাণী অন্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে নতুন এলাকার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে টিকে থাকার পর ব্যাপক হারে বংশ বিস্তারের মাধ্যমে তাদের অবস্থান শক্তিশালী করে তোলে। এ কারনে তাদেরকে স্থানীয় প্রজাতির প্রতি আগ্রাসী হয়ে উঠতে হয়।ফলে তাদের আগ্রাসনে স্থানীয় প্রজাতির জীব হয়ে উঠে হুমকির সম্মুখীন। প্রজাতির পরিণতিতে অনেক প্রজাতির অস্তিত্ব হয়ে উঠে বিপন্ন বা অনেকের বিলুপ্তিও ঘটে। আমাদের দেশে আগ্রাসী প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে আসামলতা বা রিফিউজি লতা, কচুরি পানা, লেন্টানা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রাণীর মধ্যে তেলাপিয়া, আফ্রিকান মাগুর, সিলভার কার্প জাতীয় মাছের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। জলভূমির পরিবর্তন ও আগ্রাসী প্রজাতির মাছের প্রবেশ আমাদেরর মৎস্য সম্পদের উপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তা আজ আর কাউকে বলে বোঝাতে হয় না।

(গ) প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিকল্পিত ও উৎপাদনসীমার অধিক ব্যবহারঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন প্রজাতির পণ্যের বাজার সৃষ্টি, বাজারজাতকরণের সুবিধা ইত্যাদি কারণে মানুষ অনেক প্রজাতিকে অপরিকল্পিতভাবে তার উৎপাদন হারের অধিক আহরণ করছে। ফলে প্রজাতিসমূহের বংশবিস্তার সীমিত হয়ে আসছে এবং বিপন্ন হচ্ছে তাদের টিকে থাকার ধারা। বাংলাদেশের জলাভূমি থেকে অনেক মাছ, বনাঞ্চল থেকে বন্যপ্রাণী ও বিভিন্ন গাছের প্রজাতি বিলুপ্তি না হলেও দূর্লভ হয়ে উঠেছে, যা কিছুদিন আগেও ছিল সহজলভ্য।অনেক ভেষজ উদ্ভিদ আজ আর হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় না।

(ঘ) দূষণ: যানবাহন, কল কারখানার বর্জ্য, ইট-ভাটার ধোঁয়া ও অন্যান্য অনেক কারণে মাটি, পানি ও বাতাস দূষিত হচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে জীবের আবাসস্থল, বংশবৃদ্ধি ও অন্যান্য জৈবনিক ক্রিয়াকলাপে। ফলে বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে আমাদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণসহ অনেক পরিবেশ বিষয়ক বিপর্যয় ও সংকট ঘটতে থাকবে। এক সময় আমাদের অস্তিত্বই হয়ে উঠবে হুমকির সম্মুখীন। তাই সমস্ত পৃথিবী আজ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সচেতন হয়ে উঠছে।

মানুষ তার বেঁচে থাকার প্রয়োজনে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে প্রাণী ও উদ্ভিদ দুটিকেই।বাঁচার জন্য প্রতিটি প্রাণী ও উদ্ভিদ পরস্পর নির্ভরশীল। মানুষ নির্ভরশীল প্রায় সকলের ওপর; কেবল খাবারই তার সব প্রয়োজন মিটিয়ে দেয় না, আনন্দ-বেদনার অনুভূতি তাকে আলোড়িত করে।ঘরের কাছেই দোয়েল বা কোকিল যখন ডেকে ওঠে তখন সে অদ্ভুত পুলকে শিহরিত হয়।ঠিক তেমনি দূরে কোথাও যখন বউ কথা কও পাখি ডেকে ওঠে তখন তার মন কেমন করে। আঙুলের ছোঁয়ায় লজ্জাবতীর পাতার মুখ বন্ধ হয়, গ্রীষ্মে কৃষ্ণচূড়া রাঙিয়ে দেয় বনভূমি, শিমূল পলাশ ছেয়ে যায় ফুলে ফুলে আর এসব নিয়ে রচিত হয়েছে কাব্য। জীববৈচিত্র্য না তাকলে হারিয়ে যাবে এ মন কেমন করা রূপসৌন্দর্য।মানুষের সৃষ্টিশীলতার পথে বাধার সৃষ্টি হবে।

জীববৈচিত্র্য কেন?

পৃথিবীতে কোন প্রাণীই এককভাবে টিকে থাকতে পারে না। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য দরকার অন্য জীবের সহায়তা।খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, স্বাস্থ্য, ওষুধপত্র এই সব কিছুর জন্য মানুষ অন্যান্য জীবের ওপর নির্ভরশীল।খাদ্যের জন্য মানুষ নির্ভরশীল ধান-গম-যব, গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগী-মাছ, ফলমূল, শাকসবজির ওপর। এসব উদ্ভিদ ও প্রাণীর টিকে থাকার জন্য দরকার বিভিন্ন ধরনের জীব ও অণুজীবের।বস্তু বিংবা বাসস্থান নির্মাণের জন্য মানুষ নির্ভরশীল গাছ-গাছড়া ও বৃক্ষের ওপর।উদ্ভিদের বংশবিস্তারের জন্য দরকার কীটপতঙ্গ, পশুপাখি, বায়ু ও পানি।রোগ নিরাময়ের জন্য মানুষকে যেতে হয় ভেষজ উদ্ভিদের কাছে। আবার এসব উদ্ভিদের টিকে থাকার জন্য দরকার অণুজীবের, যারা উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে।কাজেই মানুষ থেকে শুরু করে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন জীববৈচিত্র্যের। প্রাণীজগতে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে এক প্রজাতি আর এক প্রজাতির ওপর নির্ভর করে। এ প্রয়োজনেই বাঘ শিকার করে হরিণ বা মহিষ। কিন্তু সকল হরিণ বা মহিষকে হত্যা করার চেষ্ট করে না। ক্ষুধা নিবারণের প্রয়োজনেই কেবল সে শিকার করে। এভাবে বহু প্রজাতি পাশাপাশি অবস্থান করে জীববৈচিত্র্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

পৃথিবীর সকল এলাকার জীববৈচিত্র্য এক রকম নয়। এক এক এলাকার আবহাওয়া, জলবায়ু, পরিবেশ অনুযায়ী গড়ে উঠেছে এক এক ধরনের জীববৈচিত্র্য। তবে একই ধরনের আবহাওয়ায় একই ধরনের উদ্ভিদ বা প্রাণীর উদ্ভব হয়নি। অস্ট্রেলিয়া ও চিলির আবহাওয়া প্রায় একই রকম। তা সত্ত্বেও এ দুটি দেশের জীববৈচিত্র্য ভিন্ন। আবার শীতের দেশে যে সব পশুপাখি বা গাছপালা দেখা যায়, পরমের দেশে ঠিক সে রকমটি দেখা যায় না। সাগর নদী ও হ্রদগুলোতে যে সব প্রাণী বাস করে, পাহাড়-পর্বত কিংবা বরফে ঢাকা অঞ্চলে সে সব থাকে না।নদী বা পুকুর যে ধরনের মাছ হয়, সামুদ্রিক মাছ ঠিক সে রকমটি নয়।বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবীতে প্রায় দুই লক্ষ ৫০ হাজার রকমের উদ্ভিদ এবং প্রায় সমান সংখ্যক ছত্রাক রয়েছে। আরও আছে প্রায় ৩০ লক্ষ রকমের প্রাণী। বিজ্ঞানিরা এখনও সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীকে চিহ্নিত করতে পারেননি। তবে এ পর্যন্ত প্রায় ৪,১৫০ স্তন্যপায়ী, ১০,৫০০ সরীকৃপ ও উভচর, ৮,৮০০ পাখি এবং ২১.৫০০ মাছের প্রজাতি চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের নামও দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য

পাহাড় ঘেরা, নদী বিধৌত বিস্তৃত পাললিক সমভূমি ও জলাভূমি, পাহাড়ী বন, শালবন ও দক্ষিণাঞ্চলের সুন্দরবনসহ (ম্যানগ্রোভ বণাঞ্চল) বিচিত্র প্রতিবেশ অবস্থানের সমাহারে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। এক সময় প্রতিটি ভূমিরূপ ও প্রতিবেশ অবস্থানে অভিযোজিত জীববৈচিত্র্যে ভরপুর ছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদের সঠিক জরিপ ও লিপিবদ্ধকরণের কাজ এখনও সম্পন্ন হয়নি। বাংলাদেশে উচ্চবর্গের সপুষ্পক উদ্ভিদের সংখ্যা আনুমানিক পাঁচ হাজারের অধিক।নিবর্গের উদ্ভিদ তথা ছত্রাক, মস ও ফার্ণের সংখ্যাও কম নয়। বন্যপ্রাণীর মধ্যে স্তন্যপায়ী ১১৩ প্রজাতি, পাখি ৬২৮ প্রজাতি, সরীসৃপ ১২৬ প্রজাতি, মাছ (মিঠা ও লোনা পানি) ৭০৮ প্রজাতি এবং ৪০০ প্রজাতির পাওয়া যায়।অন্যান্য পর্বের প্রজাতির সংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যান এখনো অপ্রতুল। এসব প্রজাতির অধিকাংশের রয়েছে আন্তর্জাতিক তাৎপর্য। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সুন্দরবনের বাঘ, হাতি, ঘড়িয়াল, ডলফিন ও উলুক। তাছাড়া কৃষি নির্ভর বাংলাদেশ কৃষিজ জীববৈচিত্র্যেও ভরপুর। বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা যায় এক সময় বাংলাদেশে বার হাজারেরও বেশি জাতের ধান পাওয়া যেত। শাক-সবজি, ফল-মূলের রকমারী বাহার এখনও উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই, এখানে বহু প্রাণী ও গাছপালার উদ্ভব হয়েছে।এদেশের প্রধান ফসল ধান, গম, পাট, আখ, চা, তুলা, তামাক, ডাল, ভুট্টা প্রভৃতি। জরিপে দেকা গেছে, বাংলাদেশে প্রায় ১৪,০০০ রকমের ধান, ৩,৬৮৫ রকমের পাট, ২৫৬ রকমের চা, ১,০৯৮ রকমের বড় গাছ ও বাঁশ এবং ধান, পাট, চা ও আখ বাদে আরও প্রায় ২,৯২৯ রকম ফসলের প্রজাতি রয়েছে । এ ছাড়া রয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার রকমের ফুলের গাছ। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সুন্দরবন এলাকায় রয়েছে জীবের বিচিত্র সমাহার।এখানে যেমন সেগুন, মেহগনি, উড়িয়াম, গর্জন, তেলগুড়, নাগেশ্বর, চাপালিশ প্রভৃতি গাছপালা রয়েছে, তেমনি আছে সুন্দরী, গেওয়া, গোরান, গোলপাতা প্রভৃতি গাছ। আরও আছে বিচিত্র সব উদ্ভিদ ও বিরল প্রাণী।আমাদের দেশের নদ-নদী ও সাগরে আছে প্রায় ৫০০ প্রজাতির মাছ, ২২ প্রজাতির উভচর প্রাণী, ১২৪ রকমের সরীসৃপ, ৫৭৯ প্রজাতির পাখি ও ১২৫ প্রজাতির স্তন্যপায় প্রাণী। এ ছাড়া আছে বহু ধরনের কীট-পতঙ্গ। এদের ওপর এখনও সম্পূর্ণ জরিপ চালানো হয়নি। জনসংখ্যার বাড়তি চাপ এবং নির্বিচারে বিভিন্ন ধরনের সম্পদ আহরণের ফলে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য এখন হুমকির সম্মুখীন।মানষ বন কেটে নতুন নতুন বসতি স্থাপন করেছে।ফলে অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিভিন্ন গবেষণায় জানা গেছে, বাংলাদেশ থেকে ১০ রকমের স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৪ প্রজাতির পাখি ও এক প্রজাতির সরীসৃপ ইতমধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ৩৪ রকমের গাছপালা ও প্রায় ১৩৬ প্রজাতির মেরুদন্ডী প্রাণী বিলুপ্তির মুখে। কয়েক যুগ আগে বাংলাদেশের বন এলাকা ছিল গোটা দেশের ১৫ শতাংশ, এখন তা অনেক কমে গেছে। অবস্থা অনুযায়ী বিপন্ন প্রজাতিগুলোকে তাদের চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। সেগুলো হল বিলুপ্ত, মারাত্মকভাবে বিপন্ন, বিপন্ন ও নাজুক। যেগুলো মারাত্মকভাবে বিপন্ন, বিপন্ন ও নাজুক তাদের টিকিয়ে রাখতে জরুরি ব্যবস্থা নিতে হবে আমাদের। বোস্তামী কাছিম ছাড়াও বাংলাদেশে এখন বিপন্ন হয়ে পড়েছে বিভিন্ন প্রজাতির কাছিম, সরীসৃপ ও পশুপাখি। বাংলাদেশে অনেক প্রজাতির সাপ রয়েছে। এর মধ্যে সবুজ ফণিমনসা, কালকেউটে, শঙ্খিনী সাপ, শঙ্খচূড় বা গোখরা, চন্দ্রবোড়া ও ভাইপার বিষধর সাপ। বিষহীন সাপগুলো হল; অজগর, গোলবাহার, লাউডগা, জলবোড়া, কালনাগিনী, দারাজ, সবুজ কেরা সাপ, গেছো সাপ, দুধরাজ, ঘরগিন্নী, সবুজ ধোরা, কুকড়ি, লাল ধোরা, মেটে ধোরা প্রভৃতি। এরা সহজে মানুষকে আক্রমণ করে না।সাপ শুধু জীববৈচিত্র্য নয়, পরিবেশ রক্ষায়ও সাহায্য করে। বিষধর সাপও মানুষের উপকারে আসে।সাপের বিষ দিয়ে তৈরী হয় মূল্যবান জীবনরক্ষাকারী ওষুধ। সাপ দেখলেই মানুষ সাধারণত মেরে ফেলার চেষ্টা করে।এ ছাড়া বন উজাড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাপের বাসস্থানও হারিয়ে যাচ্ছে।সলাশয়ের সাপও হারাচ্ছে বসতি।ফলে অনেক প্রজাতির সাপের অস্তিত্ব এখন মারাত্মক হুমকির মুখে।কোন কোন সাপ হয়ে পড়েছে বিপন্ন। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা জরুরি।

বাংলাদেশে যে সব পাখি মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন ও বিপন্ন হয়ে পড়েছে তার মধ্যে রয়েছে: কালো তিরি, কালো ময়ূর, কালো গুন্ড্রি, কাঠ-ময়ূর, ভাঁদী হাঁস, বাঁচা হাঁস, বুলবুলি, ধনেশ, রাজ ধনেশ, পুতিয়াল ধনেশ, কাট ময়ূর, পাহাড়ি নীলকণ্ঠ, লাল মাছরাঙা, হুতুম পেঁচা, দিনকানা, পাহাড়ি ঘুঘু, হরিয়াল (হরিকল), পানিকাটা, গাংচিল, সাদা ঈগল, কুরা, রাজশকুন, সাপপাখি, বাঘা বক, কোদালী বক, হারগিলা, কোকিল, শ্যামা, দোয়েল মৌটুসি, টুনটুনি, মদনটাক, রঙিলা বক (সাদা জংগা) প্রভৃতি। এসব পাখির নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করে শিকার বন্ধ করতে পারলেই কেবল এদের রক্ষা করা সম্ভব। বাংলাদেশে বহু স্তন্যপায়ী প্রাণীর জীবনও এখন বিপন্ন হয়ে পড়েছে।নির্বিচার নিধন ও বসতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে এসব প্রাণীর অস্তিত্ব এখন বিপন্ন। এই বিপন্ন প্রাণীগুলো হল: লজ্জাবতী বানর, লম্বালেজী বানর, উল্টালেজী বানর, হনুমান, চশমাপরা হনুমান, লাল হনুমান, উল্লুক, শিয়াল, রামকুত্তা, খেকশিয়াল, বনবিড়াল, গেছো বাঘ, বড় বেজী, উদবিড়াল (ভোঁদড়), ভালুক, গেছো ভাল্লুক, গন্ধগোকুল, খাটাশ, শুশুক, হাতি, সাম্বার, মায়া হরিণ, বন ছাগল, বনরুই, সজারু, খরগোশ প্রভৃতি। মানুষের কর্মকান্ডের ফলেই আমাদের দেশে উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। জনসংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধির কারণে মানুষের বসতির জন্য বন কাটা এবং ফসলের জমিতে ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে হয়।নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে বিপুল সংখ্যক প্রাণী তাদের বাসস্থান হারাচ্ছে। ফলে এসব প্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করেন, পার্বত্য এলাকায় জুমচাষ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জুমচাষীরা যে এলাকায় আবাদ করে সে এলাকার বনাঞ্চল পুড়িয়ে দেয়। এতে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ধ্বংস হয়।বহু রকমের পোকা-মাকড় ও প্রাণী আশ্রয় হারিয়ে ফেলে। এ ছাড়া বন পোড়ানোর ফলে মাটির উপরিভাগও পুড়ে যায়। এত জমির উর্বরাশক্তি নষ্ট হয়।ফলে সেখানে ছোট ছোট উদ্ভিদ আর জন্মাতে পারে না। বনাঞ্চলে জনবসতি গড়ার ফলে প্রাকৃতিক বন ও বন্যাপ্রাণীরর ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। অপরিকল্পেতিভাবে জনপদ সৃষ্টির ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশেরও ক্ষতি হচ্ছে। এত জীববৈচিত্র্যের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। শুকনো মওসুমে গঙ্গার পানিপ্রবাহ কমে যায় বলে সুন্দরবন এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। ফলে ওই এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় থাকে না। সুন্দরবন এলাকার গাছপালা যে লবনাক্ততায় বেঁচে থাকে, লবণাক্ততার পরিমান এর চেয়ে বেশি হলে গাছগুলো নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মরে যায়। ফলে সে সব গাছপালায় বসবাসকারী বন্যপ্রাণীর জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়ে। এছাড়া এখন স্রোতজ বন কেটে চিংড়ি চাষ করা হচ্ছে। তাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। ঘন ঘন বন্যা, খরা, সাইক্লোন, টর্নেডো ও জলোচ্ছ্বাসসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ জীববৈচিত্র্যের পক্ষে হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কখনও কখনও কোন কোন প্রজাতি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব ও জমিতে রাসায়নিক সাব ব্যবহারের ফলেও

জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিল্পকারখানাগুলোর বর্জ্য কখনও কখনও সরাসরি কোন জলাশয় বা নদী, খোলা জায়গায় অথবা ডোবায় ফেলা হয়। প্রতিবেশের জন্য এ বর্জ্য খুবই ক্ষতিকর। আবার নদীতে বর্জ্য নিক্ষেপের ফলে জলজ প্রাণী মারা যায় কিংবা নানা রোগে আক্রান্ত হয়।একইভাবে জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে আশপাশের পুকুর ও জলাশয়ের পানি দূষিত হয়ে পড়ে এবং মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী মারা যায় অথবা বংশ বিস্তার করতে পারে না। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, পানি নিষ্কশন ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি এবং বাঁধ দিয়ে নিচু জমিতে চাষের ফলে পানি ও গাছপালার সঙ্গে সম্পর্কিত বহু প্রাণীর জীবন হুমকির মুখে পড়ে।উপকূল এলাকা থেকে চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করতে গিয়ে বহু জলজ প্রাণী নিধন করা হচ্ছে। সাধারণত চিংড়ির পোনার সঙ্গে জালে ধরা পড়ে আরও অনেক জলজ প্রাণীর পোনা। কিন্তু সংগ্রহকারীরা চিংড়ি পোনা রেখে অন্য পোনাগুলোকে ডাঙায় ফেলে দেয়।ফলে সে সব পোনা মারা যায়।পাখি শিকারের ফলেও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। শুধু দেশীয় পাখি ঘুঘু-বকই নয়, শিকারীরা যাযাবর পাখিও শিকার করে।উচ্চ ফলনশীল শস্য ও বীজের অপরিকল্পিত ব্যবহারের ফলেও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। আমাদের দেশে এক সময় প্রায় ১৪,০০০ রকমের ধান ছিল। এখন বেশির ভাগ জমিতে কয়েক রকমের উচ্চ ফলনশীল ধানে চাষ হচ্ছে। এতে হারিয়ে যাচ্ছে অন্যান্য ধান। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জ্ঞান ও সচেতনতার অভাব। অনেক সময় নিতান্তই অবহেলা করে মানুষ বহু উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষতি করে। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহন প্রয়োজন।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ:

প্রথিবীতে কোন প্রাণীই এককভাবে বাঁচতে পারে না। সব প্রাণীই বেচে থাকে একে অপরের ওপর নির্ভর করে।ফুল-ফল, শস্যের বংশবিস্তারের জন্য দরকার পাখি ও কীটপতঙ্গ। ইঁদুর ফসলের ক্ষতি করে, সাপ ইঁদুর খায়। সাপকে খায় ঈগল। কাক, শকুন শেয়াল এসব প্রাণী মৃত প্রাণীর মাংস খেয়ে পরিবেশকে দূষণ থেকে রক্ষা করে। পাখিরা সাধারণত এমন গাছেই বাসা বাঁধে বা বাস করে যেখানে নরম ফল পাওয়া যায়। একটি বটগাছ কেটে ফেলা হলে অনেক প্রজাতির পাখি আশ্রয় হারায়। আমরা যদি ফলের গাছ বা বটগাছ কেটে শুধু শাল, সেগুন, মেহগনির গাছ লাগাই তা হলে অনেক পাখি আর বাসা বাঁধতে পারবে না। তারা অন্য কোথাও চলে যাবে বিংবা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমাদের দেশে ইউক্যালিপ্টাস বা আকাশিয়া গাছে কোন পাখিকে বাসা বাঁধতে দেখা যায় না। ভিনদেশী এসব গাছ জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর। পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য রাখার জন্যই জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য জনগণকে সচেতন করে তোলা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দেশে ইতিমধ্যে যে জীববৈচিত্র্য রয়েছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান তৈরী করে তালিকাভূক্ত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।সেই সঙ্গে জীবজন্তু সংরক্ষণে বর্তমানে যে সব ব্যবস্থা চালু আছে, সেগুলো আরও বাড়ানো দরকার।বিপন্ন পাখি ও পশুর তালিকা তৈরি করে তাদের সংরক্ষণ করার জন্য আলাদা চিড়িয়াখানা বা সংরক্ষিত এলাকার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণের জন্য দরকার কঠোর আইন।সে আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকার, বন সংরক্ষণকারী ও সাধারণ মানুষকেও সচেতন ও আন্তরিক হতে হবে। স্থানীয় বিভিন্ন জাতের শস্যবীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে কোন উদ্ভিদ প্রজাতি হারিয়ে না যায়। উপকূলীয় এলাকা থেকে চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করার বিষয়টিও বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। চিংড়ি চাষের জন্য হ্যাচারি থেকে পোনা সরবরাহ করা যায়। এসব কাজের জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে আমাদের। আজ গোটা পৃথিবী জুড়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্বটি মানুষ আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে। আর এ গুরুত্বটি অনেক আগেই উন্নত দেশগুলো বুঝতে পারছে। আর পেরে বিভিন্ন সুকৌশলে তারা আমাদের সব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য এবং তাদের জ্বীন সংগ্রহ করে তারা সেগুলোর চাষাবাদ ও বংশবৃদ্ধি করে তাদের নিজস্ব জীববৈচিত্র্য বলে চালিয়ে একচ্ছত্র মালিকানা নেয়ার হীন চেষ্টায় লিপ্ত। যেমনটি ফরাসী এবং আমেরিকানরা এ উপমহাদেশের বাঁশমতি চাল নিয়ে "টেক্সমতি" নাম দিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করছে। নিমকে আমেরিকা প্যাটেন্ট করেছে। উচ্চ ফলনশীল জাতের চাষাবাদের লোভ দেখিয়ে উন্নত বিশ্ব আমাদের প্রতিনিয়ত তাদের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল করে তুলছে অন্যদিকে আমরা নিজস্ব জাতসমূহের বীজ সংরক্ষণ না করে দিন দিন হয়ে পড়ছি নিঃস্ব। এ ব্যাপারে এখনই সজাগ না হলে এবং ব্যবস্থা না নিলে প্রতিটি জীববৈচিত্র্যের মালিকানা আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত মানুষকে তার জীববৈচিত্র্যের অধিকার এবং সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতন করতে হবে আর এ ব্যাপারে সরকারী উদ্দ্যোগের পাশাপাশি বে-সরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে । বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে দেশীয় জীব নিয়ে অধিকতর গবেষণা বৃদ্ধি করতে হবে।আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে এ ব্যাপারে কাজ করতে পারি আর দেশের সরকার এবং বিরোধিদলসহ সকল রাজনৈতিক দলসমূহকে সকল বিভেদের উর্দ্ধে উঠে জীববৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে ধরে রাখতে একযোগে কাজ করতে হবে। কবি বলেছেন "জীবে দয়া করে যে জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর" আসুন আজ এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আমরা শপথ নেই যে আমাদের ভবিষ্যতের প্রতিটি কর্মই হউক আগামী বংশধরদের জন্য একটি জীববৈচিত্র্যপূর্ণ বাংলাদেশ রেখে যাওয়ার অঙ্গীকার"।

ছবি: সংগৃহীত

মিডিয়ার বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জ

সানজিদা আক্তার
শিক্ষার্থী, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান বিশ্বে মিডিয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। খবর পাওয়া থেকে শুরু করে মত প্রকাশ, জনসচেতনতা তৈরি, বিনোদন কিংবা রাজনৈতিক চর্চা–সবকিছুতেই মিডিয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমটি বর্তমানে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সংকটের মুখোমুখি। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তার, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক চাপ, সাংবাদিকদের নিরাপত্তাহীনতা এবং বিশ্বস্ততার সংকট- সব মিলিয়ে মিডিয়া এখন এক জটিল বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।

মিডিয়ার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বিশ্বস্ততা ও বস্তুনিষ্ঠতার সংকট। অনেক সংবাদমাধ্যমই এখন নিরপেক্ষতা হারাচ্ছে, পক্ষপাতমূলক সংবাদ পরিবেশন করছে। সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সত্যতা যাচাইয়ের চেয়ে আগেভাগে প্রকাশ করাই যেন মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার ফলে ভুল তথ্য বা গুজব ছড়িয়ে পড়ছে, আর জনগণের বিশ্বাসে ফাটল ধরছে। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এই সংকট আরো তীব্র। ফেসবুক, টিকটক বা ইউটিউবের মতো প্ল্যাটফর্মে প্রায়ই যাচাইবিহীন তথ্য ভাইরাল হয়, যা সমাজে বিভ্রান্তি তৈরি করে। রাজনৈতিক চাপ ও মালিকানার দ্বন্দ্ব মিডিয়ার স্বাধীনতা হরণ করছে। অনেক সংবাদমাধ্যম কোনো রাজনৈতিক দলের মালিকানায় পরিচালিত হয় অথবা বিজ্ঞাপনদাতার স্বার্থরক্ষায় নির্দিষ্ট ধাঁচের সংবাদ প্রকাশ করে। এতে করে সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের পর সাংবাদিকদের হুমকি-ধমকি এমনকি মামলা-মোকদ্দমার সম্মুখীন হতে হয়। ডিজিটাল মিডিয়া যেমন দ্রুততা ও বহুমাত্রিকতার সুযোগ দিয়েছে, তেমনি এর কারণে প্রচলিত প্রিন্ট ও টেলিভিশন মিডিয়া চ্যালেঞ্জে পড়েছে। অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোর প্রতিযোগিতা, 'ক্লিকবেইট' শিরোনাম, 'ভিউ'-নির্ভরতা অনেক সময় সংবাদকে রূপান্তর করে বিনোদনকেন্দ্রিক সামগ্রীতে। ফলে সমাজ সচেতনতা তৈরির চেয়ে মুনাফা অর্জনই মুখ্য হয়ে ওঠে।

সাংবাদিকদের কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তার অভাব মিডিয়ার অগ্রগতির পথে বড় বাধা। সাংবাদিকরা ন্যায্য পারিশ্রমিক পান না, পেশাগত প্রশিক্ষণের সুযোগ নেই এবং চাকরির নিশ্চয়তাও অনিশ্চিত। বিশেষ করে স্থানীয় সাংবাদিকরা নানা ঝুঁকির মধ্যে থেকে দায়িত্ব পালন করেন। এর ফলে পেশাগত মান ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

তবে সব নেতিবাচকতার মধ্যেও আশার আলো রয়েছে। আজকের নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকরা প্রযুক্তি-দক্ষ, সাহসী এবং অধিক সচেতন। তথ্য যাচাই, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে তারা দক্ষ। অনেক শিক্ষিত তরুণ এখন সাংবাদিকতাকে দায়িত্বশীল পেশা হিসেবে নিচ্ছেন, যা ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক বার্তা।

তাছাড়া গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে, যদিও সমান সুযোগ এখনো নিশ্চিত হয়নি। কিন্তু এই অংশগ্রহণ গণমাধ্যমের বৈচিত্র্য ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। সমাজে গণমাধ্যমের ভূমিকা একদিকে যেমন শক্তিশালী, অন্যদিকে তা অত্যন্ত সংবেদনশীলও। এটি মানুষের মত গঠনের প্রধান মাধ্যম, তাই এর দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা অত্যন্ত জরুরি। মিডিয়ার প্রয়োজন সত্য, নিরপেক্ষ ও জনমুখী সংবাদ পরিবেশন করা; রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে মানুষের কথা বলা।

একবিংশ শতাব্দীতে মিডিয়া চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ততটাই চ্যালেঞ্জপূর্ণও। সঠিক নীতিমালা, স্বাধীন কর্মপরিবেশ, সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করতে পারলেই এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে মিডিয়া একটি শক্তিশালী ও জনমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে।

ফেসবুক সাংবাদিকতা—তথ্য না আবেগের প্রতিচ্ছবি?

মোঃ হাসিবুল হাসান
শিক্ষার্থী, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফেসবুক হয়ে উঠেছে একটি 'ত্বরিত সংবাদমাধ্যম' ।কেউ দুর্ঘটনার ছবি আপলোড করলেই সেটি মুহূর্তে ভাইরাল হয়, কেউ একটি দাবি করলেই সেটি বিশ্বাসযোগ্য বিবৃতিতে রূপ নেয়। যেন সাংবাদিকতা এখন প্রতিটি মানুষের হাতের মুঠোয়। তবে প্রশ্ন হলো—এই তথাকথিত 'ফেসবুক সাংবাদিকতা' কি আসলেই সাংবাদিকতা? নাকি এটি আবেগনির্ভর, যাচাইবিহীন কিছু মতামতের প্রতিচ্ছবি?

একজন পেশাদার সাংবাদিক যেভাবে একটি তথ্য যাচাই করেন- যেমন উভয় পক্ষের বক্তব্য নেওয়া, ঘটনাস্থলে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করা, নির্ভরযোগ্য সূত্র যাচাই করা- তা ফেসবুক পোস্টে খুব কমই দেখা যায়। ফলে অনেক সময় দেখা যায়, ভুল তথ্য ভাইরাল হয়ে সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।একটি উদাহরণ দিই- গত বছর খুলনায় একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে যেখানে একজন শিক্ষককে মারধর করা হচ্ছে দেখা যায়। ভিডিওটি দেখে অনেকেই অভিযোগ তোলে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ।কিন্তু পরে জানা যায়, ঘটনাটি ছিল পারিবারিক এবং পুরো ঘটনা ছিল ভিডিওর বাইরে। তখন আর কেউ সেই ভুলের দায় নেয় না। এই ধরনের পরিস্থিতি শুধু একজন ব্যক্তিকে নয়, কখনো কখনো একটি প্রতিষ্ঠানের ইমেজও ক্ষতিগ্রস্ত করে। অথচ ফেসবুক ব্যবহারকারীদের অনেকে মনে করেন, 'আমি তো নিজের মতামতই দিচ্ছি!' কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই মতামতের পেছনে কি সত্যিকারের তথ্য আছে?

সাংবাদিকতা শুধু তথ্য পরিবেশনের কাজ নয়, এটি নৈতিকতা, দায়িত্ব এবং সচেতনতার প্রকাশ। যেহেতু এখন অনেকেই নাগরিক সাংবাদিক হিসেবে কাজ করছেন, তাই তাঁদের মধ্যে এই দায়িত্ববোধ থাকা জরুরি। ফেসবুকে সংবাদ শেয়ার করার আগে যাচাই করা, উৎস উল্লেখ করা এবং কারো সম্মানহানিকর কিছু প্রকাশ না করাই হওয়া উচিত সামাজিক দায়িত্ব। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আমাদের খবর ছড়ানোর গতি বাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু এটি যদি বিশ্বাসযোগ্যতার জায়গা হারায়, তবে গণমাধ্যমের ওপরই জনগণের আস্থা হারিয়ে যাবে। তাই ফেসবুকে সংবাদ পরিবেশন করার আগে আমাদের ভাবা উচিত- আমি কি সত্য বলছি, নাকি শুধুই ভাইরাল হওয়ার প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছি?

সবুজের কোলে গড়ে ওঠা জ্ঞানের স্বপ্নপুরী

আলকামা রমিন
সাংগঠনিক সম্পাদক
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি

যেন কোনো আরণ্যক উপন্যাসের পাতা থেকে উঠে আসা এক চিরসবুজ রাজ্য খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকৃতি আর পাঠশালার মিষ্টি মেলবন্ধন এখানে গড়ে তুলেছে এক অপার্থিব পরিবেশ।জারুল-পলাশের ছায়ায়, পদ্মপুকুরের ঘ্রাণে আর পাখিদের গানের ভেলায় বয়ে চলে জীবনের পাঠ। ১০৬ একরের এই প্রশান্ত ক্যাম্পাসে পা রাখলেই হৃদয়ে বাজে পড়াশুনার এক অদ্ভুত টান। আর প্রকৃতির মৃদুমন্দ ছোঁয়ায় কল্পনার ডানা মেলে উড়ে যাওয়া যায় দুরন্ত আকাশে। মূল ফটকের পাশে টলটলে পানির পুকুর আর লাল শাপলার লাজুক হাসি জানান দেয় শুভ সকালের সম্ভাষণ। ঢুকতেই শহিদ মীর মুগ্ধ তোরণ মনে করিয়ে দেয় '২৪র গণঅভ্যুত্থানের কথা। সামনের ফুলেল বৃক্ষরাজি দুহাত মেলে দেয় আপনাকে বরণ করে নিতে। প্রশাসনিক ভবনের পাদদেশেও রঙিন পুষ্পরাজির আনন্দে ভরে থাকে বাতাস। আরো কয়েক পা এগুতেই চোখে পড়বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্যানমগ্ন মণি লালন লেক। জলের বিশুদ্ধ শরীর সেখানে শান্তির এক মহাকাব্য রচনা করে চলেছে। হাঁটার জন্য সাজানো ছায়াঘেরা পথ, গাছের সারি সব মিলিয়ে এক অপূর্ব অবকাশ। রাতে শিউলি ফুলের মাদকতায় যেন হারিয়ে যায় শহরের সব কোলাহল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃদয়ে যোগ হয়েছে এক নতুন ক্যাফেটেরিয়া। বাঁশঝাড়, পদ্ম-শাপলার পুকুর আর হোগলার বনের গা ঘেঁষে থাকা এই মুক্তঘর যেন দিনশেষের ক্লান্ত শরীর আর মনের আনন্দমিশ্র স্মৃতির আশ্রয়। গোলপাতার ছাউনিতে মোড়া চালায় গল্প জমে হাসিতে, আর পাশের কচুরিপানার ফাঁক থেকে উঁকি দেয় শৈশবের দুরন্ত স্মৃতি। পেছনে প্রযুক্তির নির্যাস মেশানো কেন্দ্রীয় গবেষণাগার প্রকৃতি আর প্রযুক্তির সাথে নীরব হাত মেলানোর সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অদম্য বাংলার পাশে নবগঠিত জলাশয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা রক্তশাপলার হাসি কেঁড়ে নেয় চোখের দৃষ্টি। কলিগুলোও যেন ফোটার অপেক্ষায় দিন গুনছে।

পাখির কিচিরমিচির লেগেই থাকে খুবির আকাশে-বাতাসে। মূল ফটক থেকে দৃষ্টি সোজা ফেললে চোখ আটকে যায় অদম্য বাংলা ভাস্কর্যের দৃপ্ততায়। সড়কের দুপাশ জুড়ে ফুলের মেলা, আর বকুলের মিষ্টি ঘ্রাণে মাতাল হয়ে ওঠে পথচারী মন। শিউলির লোভে মৌমাছিদেরও রমরমা ভিড়। আবাসিক হলগুলোর প্রতিটি কোণ যেন ফুল আর গাছের আনন্দমঞ্চ।নারকেল গাছের সারি এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সময়ের ছায়াপথ গুনে রাখা যায় ।বকুলের ছায়ায় হারিয়ে যায় দুপুর।ক্যাম্পাসের বুনো হলুদ ফুল আবার মনে করিয়ে দেয় বিভূতিভূষণের ‘আরণ্যক’-এর এক নির্জন অধ্যায়ের কথা। পাখিদের নিরাপদ নিবাস এই বিশ্ববিদ্যালয়।জলাশয়ে রাতের চাঁদের আলোর ঝলকানি সবকিছু মিলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় যেন হয়ে ওঠেছে স্বপ্নের এক ছবি। মুক্তমঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে শ্বেতকাঞ্চন আর কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় গা ভাসাতে ইচ্ছে করে।গ্রীষ্মের দুপুরে আম, কামরাঙা, জাম্বুরা আর কাঁঠালের গাছগুলো হয়ে ওঠে পাখিদের এক বিশাল ভোজের আসর। কাজী নজরুল ইসলাম কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর নীরব নিঃশ্বাসে ডুবে গিয়ে বই আর জার্নালের পাতায় হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে সময়ের হিসাব ভুলে।

অনিকেত প্রান্তর যেন এক নির্জনতার অবিকল্প নাম। বিকেলে ক্যাম্পাসে আড্ডা আর গানের আসর জমে উঠলে মনে হয়, আর্টসেল ব্যান্ডের সেই অনিকেত গান যেন বাতাসের ঢেউয়ে ভাসছে। এই প্রান্তরে দাঁড়িয়ে থাকা স্তম্ভগুলো বহন করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। যেখানে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. গোলাম রহমান প্রশাসনিক ভবন, সেখানেই ছিল একসময়ের বেতার কেন্দ্র। রক্ত, আশা আর বিজয়ের গল্প মিশে আছে প্রতিটি ইটে, প্রতিটি ধুলোকণায়। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার সত্যানন্দ পাইক রঙ আর বালুর মিশেলে গড়ে তুলেছেন নদী, গাছপালা ও খেলার মাঠ যা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি তাকে শিখিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছেও ছড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের নৈসর্গিক আবেগের ছবি।

সব মিলিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়। এ এক জীবন্ত প্রাকৃতিক কাব্য, যেখানে প্রতিটি সকাল লিখে চলে নতুন কোনো গোপন গল্পে।

ছবি: তানভীর ইসলাম

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
সাংবাদিক সমিতি (খুবিসাস)

কার্যনির্বাহী পরিষদ-২০২৪
এর কার্যক্রম

গণমাধ্যমে খুবিসাস

খুবিসাস সদস্যরা যেসকল গণমাধ্যমে সংবাদ এবং ফিচার তুলে ধরছেন তার কয়েকটি

দৈনিক জনকণ্ঠ
প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ
The Daily Janakantha

CHANNEL 24
সব সময় | সব দিকের | সব খবর

কালের কণ্ঠ

দৈনিক কালবেলা

আমার দেশ
THE DAILY AMAR DESH

দক্ষিণাঞ্চল প্রতিদিন
সময়ের সাথে সত্যের পথে
THE DAKHINANCHAL PROTIDIN

যায়যায়দিন

DBC 24/7 NEWS

শেয়ার বিজ
সৃজনের পথে উন্নত স্বদেশ

সত্যের নতুন সারথি
নয়া শতাব্দী

আজকের পত্রিকা

আমার সংবাদ

নয়া দিগন্ত

প্রতিদিনের সংবাদ

দৈনিক নিউজ পোর্টাল ও বার্তা সংস্থা
একুশে সংবাদ.কম
www.ekusheysangbad.com

দৈনিক ডেল্টা টাইমস্
সবার সাথে সব সময়

দৈনিক জন্মভূমি
DAINIK JANMOBHUMI

THE DAILY CAMPUS

breakingnews.com.bd
যখনই ঘটনা তখনই সংবাদ

Report 71

ঢাকা ভয়েস

প্রতি মুহূর্তের খবর
risingbd.com

পল্লী নিউজ

ক্যাম্পাস টাইমস
campustimes.press

THE DAILY Messenger

খবর সংযোগ

খুলনা গেজেট

জুলাই আন্দোলনের কাভারেজ

৭ জুন

কালবেলা

কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে খুবি শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

খুবি প্রতিনিধি

প্রকাশ : ০৭ জুন ২০২৪, ০৪:৫৮ পিএম | অনলাইন সংস্করণ

12 Shares

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন। ছবি : কালবেলা

৬ জুলাই

কালবেলা

বেশিরভাগ ক্যাম্পাস ছুটির দিনেও উত্তাল

দ্বিতীয় দিনের মতো ছাত্র সমাবেশ করেছেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) শিক্ষার্থীরা। বিকেল ৪টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদি চত্বরে অবস্থান কর্মসূচি শেষে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে খুলনা জিরো পয়েন্ট মহাসড়ক অবরোধ করেন তিন শতাধিক শিক্ষার্থী। এ সময় নগরীর জিরো পয়েন্ট এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

কালবেলা

৯ জুলাই

দৈনিক জনকণ্ঠ

ফের রাজপথ অবরোধ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ সরকারি চাকরিতে নিয়োগে কোটা পদ্ধতি বাতিল এবং ২০১৮ সালের পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে শাহবাগসহ রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবরোধ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি), ঢাকা কলেজ ও ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরা। তাদের অবরোধের কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েন পরিবহনের যাত্রীরা। সোমবার দুপুর থেকে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক দখল করেন তারা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই আন্দোলন লাগাতার চলবে বলে জানা গেছে।

চরম ভোগান্তি

জানা যায়, পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী সোমবার বিকেল তিনটা ৫০ মিনিটের দিকে সায়েন্সল্যাব মোড় অবরোধ করেন আন্দোলনরত ঢাকা কলেজ ও ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরা। বিকেল চারটার পর শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন ঢাবি শিক্ষার্থীরা। এ (২ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ বেলা সাড়ে ৪টা থেকে সাড়ে ৬টা পর্যন্ত খুলনা-ঢাকা মহাসড়কের সাচিবুনিয়া মোড় এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন শিক্ষার্থীরা।

এর আগে শিক্ষার্থীরা দুইদিন জিরো পয়েন্ট মোড় ও দুইদিন শিববাড়ির মোড়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন।

কোটা বাতিলের দাবিতে সো... অবরোধ করে —জনকণ্ঠ

দৈনিক ডেল্টা টাইমস

নারী কোটা চাই না, নারীরা অগ্রসর: খুবি ছাত্রী

৫ জুলাই

কালবেলা

কোটাবিরোধীদের এবার ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা

মহাসড়ক অবরোধ খুবি শিক্ষার্থীদের: কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) শিক্ষার্থীরা। গতকাল বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে মিছিল নিয়ে জিরো পয়েন্টে গিয়ে মহাসড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের এই অবরোধের ফলে খুলনা-ঢাকা, খুলনা-সাতক্ষীরা, খুলনা-মোংলা, খুলনা-বাগেরহাট মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

১১ জুলাই

দৈনিক জনকণ্ঠ

নির্বাহী বিভাগের প্রতিশ্রুতি পেলে শিক্ষার্থীরা রাজপথ ছাড়বেন

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ কোটা পুনর্বহালের রায় বাতিল এবং সংসদে আইন পাস করে কোটা তুলে দেওয়ার দাবিতে খুলনা-ঢাকা ও খুলনা-বাগেরহাট মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) শিক্ষার্থীরা। বুধবার (১০ জুলাই) বিকেল চারটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদী চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে তারা নগরীর সাচিবুনিয়া বিশ্বরোড মোড়ে অবস্থান নিয়ে সড়ক অবরোধ করেন।

দক্ষিণাঞ্চল প্রতিদিন

বৃষ্টি উপেক্ষা করে খুবি শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলন

১০ জুলাই

কালবেলা

১২ জুলাই

দৈনিক জনকণ্ঠ

পুলিশ কঠোর অবস্থানে

জুলাই আন্দোলনের কাভারেজ

১৩ জুলাই

দক্ষিণাঞ্চল প্রতিদিন

কোটা আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) শিক্ষার্থীরা। - দক্ষিণাঞ্চল

শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে খুবিতে বিক্ষোভ

খুবি প্রতিনিধি

সংসদে আইন পাশ করে কোটা সংস্কারের দাবি ও বিভিন্ন ক্যাম্পাসে কোটা আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদী চত্বর থেকে এ বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়।

মিছিলটি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু একাডেমিক ভবন, কেন্দ্রীয় মন্দির, অপরাজিতা ছাত্রী হল, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, আবাসিক ছাত্র হল, শহিদ তাজ উদ্দিন আহমেদ প্রশাসন ভবনসহ বিভিন্ন ভবনের সামনে দিয়ে পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ ফাঁড়ির সামনে দিয়ে প্রধান ফটকের সামনে গিয়ে অবস্থান নেয়। তবে এসময় সড়কের একপাশে অবরোধ করায় যান চলাচল স্বাভাবিক ছিল।

শিক্ষার্থীরা বলেন, বৈষম্যমূলক কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলায় বিভিন্ন ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের লাঠিচার্জ করে আহত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের গায়ে কেন হাত দেয়া হলো প্রশাসনকে এর জবাব দিতে হবে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ দিয়ে হামলা করে ছাত্র সমাজকে দমানো যাবে না।

বিক্ষোভে শিক্ষার্থীরা 'ক্যাম্পাসে পুলিশ কেন?, প্রশাসন জবাব চাই', 'জবাব চাই দিতে হবে' 'আমার সোনার বাংলায় বৈষম্যের ঠাঁই নাই', 'সারা বাংলায় খবর দে, কোটা প্রথার কবর দে' সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

কোটা সংস্কার

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ

জনকণ্ঠ ডেস্ক ॥ সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এর মধ্যে অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে জগন্নাথ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

(২ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

বিভিন্ন শিক্ষা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন। খবর স্টাফ রিপোর্টার, সংবাদদাতা ও প্রতিনিধির।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ কোটা সংস্কারের দাবি ও আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) শিক্ষার্থীরা। শুক্রবার বিকেল ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদী চত্বর থেকে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী নিয়ে এ বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু একাডেমিক ভবন, কেন্দ্রীয় মন্দির, অপরাজিতা ছাত্রী হল এবং কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের সামনে দিয়ে প্রদক্ষিণ করে পরে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে দিয়ে তিন আবাসিক ছাত্র হলের সামনে দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরে তারা শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ প্রশাসন ভবন ও উপাচার্যের বাস ভবনের সামনে দিয়ে প্রদক্ষিণ করে পুলিশ ফাঁড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নেন।

১৪ জুলাই

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৪ ঘণ্টার মধ্যে মামলা তুলে নেওয়ার আল্টিমেটাম

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীরা শনিবার ঢাবির কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে সংবাদ সম্মেলন করেন -জনকণ্ঠ

আজ গণপদযাত্রা ও রাষ্ট্রপতি বরাবর স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি কোটা আন্দোলনকারীদের

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের নামে দেওয়া মামলা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মামলা তুলে নেওয়ার আল্টিমেটাম দিয়েছে কোটা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের ওপর যারা হামলা করেছে তাদের বিচার ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলা

(৯ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

২৪ ঘণ্টার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তুলে না নিলে আন্দোলনকারীরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে বলে জানিয়েছে।

(খুবির অংশ)

... খুবি প্রতিনিধি জানান, কোটা পদ্ধতি সংস্কারের এক দফা দাবি নিয়ে ... খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) শিক্ষার্থীরা। ...

১৫ জুলাই

দৈনিক জনকণ্ঠ

কোটা সমস্যা সমাধানে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

- সংসদের জরুরি অধিবেশন ডেকে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি
- রাষ্ট্রপতি বরাবর স্মারকলিপি প্রদান শেষে আন্দোলনকারীদের ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ জাতীয় সংসদের জরুরি অধিবেশন ডেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোটা সমস্যার যৌক্তিক সমাধানের আল্টিমেটাম দিয়েছে কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীরা। রবিবার দুপুরে আন্দোলনকারীরা পদযাত্রা নিয়ে রাষ্ট্রপতি বরাবর

(২ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

রবিবার বৈষম্যবিরোধী কোটা আন্দোলনকারীরা বঙ্গভবনের উদ্দেশে গণপদযাত্রা করে। শাহবাগ থেকে তোলা -জনকণ্ঠ

(খুবির অংশ)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ বিকেল সাড়ে তিনটায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ... মোড়ে একত্রিত হয়ে শোভাযাত্রা করে জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বরাবরে স্মারকলিপি দেন। ... শিক্ষার্থীরা শহীদ হাদিস পার্কে জড়ো হয়ে 'বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন'-এর ব্যানারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা পদযাত্রা করে জেলা প্রশাসকের কাছে রাষ্ট্রপতি বরাবরে স্মারকলিপি দেন। পরে শিক্ষার্থীরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ... পর্যন্ত পদযাত্রা করেন।

দৈনিক কালবেলা

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মধ্যরাতে উত্তাল

কোটা নিয়ে বক্তব্য

দৈনিক ডেল্টা টাইমস

কোটা বৈষম্য নিরসনের দাবিতে খুবি শিক্ষার্থীদের স্মারকলিপি

... খুবি

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রোববার (১৪ জুলাই) জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এই স্মারকলিপিতে তারা জাতীয় সংসদে জরুরি অধিবেশন আহ্বান করে তাদের দাবি পূরণের জন্য আলোচনার দাবি জানিয়েছেন। স্মারকলিপিতে উল্লিখিত প্রধান দাবি হল:

সরকারি চাকরিতে সকল গ্রেডে অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল করে সংবিধানে উল্লিখিত অনগ্রসর গোষ্ঠী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য কোটাকে ন্যায্যতার ভিত্তিতে ন্যূনতম পর্যায়ে (সর্বোচ্চ ৫%) এনে সংসদে আইন পাস করে কোটা পদ্ধতিকে সংস্কার করতে হবে। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বলেন, বর্তমান কোটা ব্যবস্থা অন্যায় ও বৈষম্যমূলক। তারা মনে করেন, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া উচিত।

এই মুহূর্তে জাতীয় সংসদে জরুরি অধিবেশন আহ্বান করা হবে কিনা তা নিশ্চিত না। তবে, কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের এই পদক্ষেপ কোটা সংস্কার আন্দোলনে নতুন করে জোরালো আলোচনার সূচনা করতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এর আগে গত শুক্রবার (১২জুলাই) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে রাজধানীতে ব্যাপক মিছিল ও সমাবেশ করেছিল।

১৬ জুলাই

দৈনিক জনকণ্ঠ

শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনে খুবি শিক্ষকদের সংহতি প্রকাশ

খুবি প্রতিনিধি

প্রকাশিত : ১৯ :৪৫, ১৬ জুলাই ২০২৪

বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদী চত্বরে মানববন্ধন করেন শিক্ষকরা।

১৭ জুলাই

আজকের পত্রিকা

হল না ছাড়ার সিদ্ধান্ত খুবি শিক্ষার্থীদের

খুবি প্রতিনিধি

প্রকাশ : ১৭ জুলাই ২০২৪, ১৫ : ৩৯

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) সব শিক্ষা কার্যক্রম পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আজ বুধবার বিকেল ৫টার মধ্যে ছাত্রদের এবং আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে হল ছাড়ার নির্দেশ দিলেও হল না ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

আজ বুধবার দুপুরে খুবিতে বৈষম্যবিরোধী কোটা আন্দোলনের একাধিক সমন্বয়ক আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এ ব্যাপারে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জহুরুল ইসলাম তানভীর বলেন, 'এ সিদ্ধান্ত আমরা প্রত্যাখ্যান করছি। আমাদের যৌক্তিক আন্দোলনকে থামাতে এ সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। হল না ছাড়ার বিষয়ে আমরা সব শিক্ষার্থী ঐক্যবদ্ধ।'

নাবিল নামে আরেক শিক্ষার্থী আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'আমরা হল ছাড়ার পক্ষে না। হল ছাড়তে বলার কারণ আমাদের আন্দোলন বন্ধ করা। আমরা এই ফাঁদে পা দেব না। আমরা সব শিক্ষার্থী হলেই

দৈনিক জনকণ্ঠ

ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ৬

জুলাই আন্দোলনের কাভারেজ

৩১ জুলাই

The Rising Campus

খুলনা সার্কিট হাউজ থেকে আন্দোলন প্রত্যাহারের বিবৃতি প্রত্যাখ্যান খুবি শিক্ষার্থীদের

By The Rising Campus — On জুলা ৩১, ২০২৪

Share

খুবি প্রতিনিধি : খুলনা সার্কিট হাউজে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) কিছু শিক্ষার্থীদের কোটা বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচি প্রত্যাহার বিষয়ক বিবৃতিকে প্রত্যাখ্যান করে বিবৃতি দিয়েছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

প্রতিদিনের সংবাদ

নিহত মুগ্ধকে স্মরণ করল ফাইভার

প্রকাশ : ৩১ জুলাই ২০২৪, ২০:৩৬ | অনলাইন সংস্করণ

Fiverr
1h

It's with a heavy heart that we've learned of a loss in our Fiverr family. Mir Mahfuzur Rahman Mugdho passed away last week leaving his parents and two brothers behind. Mir was a talented marketer who built a successful business on Fiverr through his expertise in SEO and social media. More than that, he was an avid traveler, a talented footballer, a Bangladesh Scout, and a true humanitarian.

Mir will be missed. Prayers to his family and friends.

Like Comment Send Share

১ আগস্ট

The Rising Campus

দুই শিক্ষার্থীকে ছাড়িয়ে আনলেন খুবির শিক্ষকরা

By The Rising Campus — On আগ ১, ২০২৪

Share

খুবি প্রতিনিধি: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচিতে খুলনা মহানগরীর বিভিন্ন সড়ক পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) ২জন শিক্ষার্থীকে আটক করে পুলিশ। পরে রাতে আটককৃত শিক্ষার্থীদের ছাড়িয়ে আনেন

আজকের পত্রিকা

মাথায় লাল কাপড় বেঁধে খুবি শিক্ষকদের মানববন্ধন

খুবি প্রতিনিধি

সারা দেশে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নিপীড়ন, হত্যা ও গণগ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) শিক্ষকেরা। আজ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদী চত্বরে মাথায় লাল কাপড় বেঁধে এ মানববন্ধন করা হয়।

বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের প্রায় শতাধিক শিক্ষক মানববন্ধনে অংশ নেন। এ সময় তাঁরা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের হত্যা, গ্রেপ্তার ও হয়রানির প্রতিবাদ জানান এবং গ্রেপ্তার শিক্ষার্থীদের মুক্তির দাবি জানান।

মানববন্ধনে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. অনির্বাণ মোস্তফা বলেন, 'এ প্রজন্ম আমাকে শেখাল, দাসত্ব কীভাবে ভাঙতে হয়। এ প্রজন্মকে আমি স্যালুট জানাই। আমি শিক্ষক হলেও না বরং ওরাই আমার শিক্ষক। ওরা আমাকে শেখাল কীভাবে দাসত্ব ভাঙতে হয়। কারণ, আমাদের মেধাটা আসলে আস্তে আস্তে জিকে চলে এসেছে। সেই জিকের চর্চাই আমরা বেশি করছি।'

২ আগস্ট

দৈনিক জনকণ্ঠ

খুবি শিক্ষক সমিতি

মুগ্ধসহ সকল প্রাণহানির বিচার দাবি

খুবি প্রতিনিধি ॥ কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটে যাওয়া হামলা ও সহিংসতায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) প্রাক্তন মেধাবী ছাত্র মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধসহ সকল প্রাণহানির বিচার দাবি করেছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। বৃহস্পতিবার সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এস এম ফিরোজ ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রকিবুল হাসান সিদ্দিকীর স্বাক্ষরিত গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে তারা মোট ছয়টি দাবি পেশ করেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গত দুই সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে ঘটে যাওয়া হামলা ও সহিংসতায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধসহ সকল শিক্ষার্থী ও অন্যান্য সকলের প্রাণহানির ঘটনায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গভীরভাবে মর্মাহত। সেই সঙ্গে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে শিক্ষক সমিতি।

প্রতিদিনের সংবাদ

খুলনায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ

৩ আগস্ট

আজকের পত্রিকা

হল খুলে দিতে খুবি প্রশাসনকে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

খুবি প্রতিনিধি

৪ আগস্ট

প্রতিদিনের সংবাদ

কোটা আন্দোলনে শহীদ খুবির মীর মুগ্ধের স্মরণে 'কুআ ওয়েলফেয়ার ফান্ডের' নামকরণ

৬ আগস্ট

কালবেলা

সহিংসতা-লুটপাট বন্ধে খুবি শিক্ষার্থীদের টহল

খুবি প্রতিনিধি
প্রকাশ : ০৬ আগস্ট ২০২৪, ০৬:২২ পিএম | অনলাইন সংস্করণ

সহিংসতা-লুটপাট বন্ধে খুবি শিক্ষার্থীদের টহল কার্যক্রম। ছবি : কালবেলা

শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম কাভারেজ

যায়যায়দিন

খুবিতে মার্চ ফর প্যালেস্টাইন কর্মসূচি পালন

প্রকাশ | ০৭ এপ্রিল ২০২৫, ১২:৩৯

মোস্তফা কামাল, খুবি প্রতিনিধি

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে মার্চ ফর প্যালেস্টাইন কর্মসূচি আজ ০৭ এপ্রিল (সোমবার) সকাল সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদী চত্বরে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি বর্বর আগ্রাসন ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদ এবং গাজার জনগণের প্রতি সংহতি জানিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদী চত্বরে প্রতিবাদ সমাবেশ "মার্চ ফর প্যালেস্টাইন" অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের এ কর্মসূচিতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সংহতি প্রকাশ করে সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল ডিসিপ্লিনে আজকে স্পেশাল টার্মের পরীক্ষা ছিলো, তা স্থগিত করা হয়েছে।

এসময় সমাবেশে বক্তারা অবিলম্বে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা বন্ধে বিশ্ব নেতাদের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। একইসাথে ফিলিস্তিনের মানুষদের প্রতি সবাইকে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর আহ্বান জানান। এসময় হাদী চত্বরে সমবেত হয়ে তারা, ফ্রি ফ্রি প্যালেস্টাইন, উই ওয়ান্ট জাস্টিস, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবর' স্লোগান দিতে থাকেন।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম বলেন, "ফিলিস্তিনের মানুষরা আজ পরাধীন। পাখির মত মারা হচ্ছে তাদেরকে। নামাজরত অবস্থায় তারা মারা যাচ্ছে। আল্লাহ ছাড় দেয় কিন্তু ছেড়ে দেয় না কখনো। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন করার সুযোগ করে দিক।'

উপাচার্য আরও বলেন, 'খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি নেই কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সবসময় রাজনীতি সচেতন। সত্যের পক্ষে থাকলে সত্যের জয় অবশ্যই হবে। খুলনার সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানাবো আসুন আমরা একসাথে ফিলিস্তিনের পক্ষে দাঁড়াই।'

যায়যায়দিন

খুবিতে নেসক্যাফের দোকান বন্ধ ঘোষণা

প্রকাশ | ১০ এপ্রিল ২০২৫, ২০:৪৮

খুবি প্রতিনিধি

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি বর্বর আগ্রাসন ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদ এবং গাজার জনগণের প্রতি সংহতি জানিয়ে ইসরায়েলি পণ্য বয়কটের আন্দোলন চলছে। সেই আন্দোলনের অংশ হিসেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে লেকপাড়ে অবস্থিত নেসক্যাফের দোকান বন্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) সন্ধ্যায় মুঠোফোনে বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক পরিচালক প্রফেসর ড. নাজমুস সাদাত। তিনি বলেন, "গত ৭ এপ্রিল খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে 'মার্চ ফর প্যালেস্টাইন' কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে ইসরায়েলি পণ্য বর্জনের দাবি তোলে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের এই দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় নেসক্যাফের দোকানটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেখানে বিকল্প হিসেবে একটি দেশীয় ব্র্যান্ডের দোকান বসানো হবে।"

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে শিক্ষার্থীরা সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন, ভবিষ্যতেও নিপীড়িত মানুষের ও ন্যায়ের পক্ষে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সোচ্চার ভূমিকা পালন করবে।

উল্লেখ্য, গাজায় ইসরায়েলের বর্বর হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে ৭ এপ্রিল বিশ্বব্যাপী "মার্চ ফর প্যালেস্টাইন" কর্মসূচি পালন করা হয়। এরই অংশ হিসেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজন করা হয়। সমাবেশে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে ইসরায়েলি পণ্যের বয়কটের দাবি জানান।

কালবেলা

খুবি ভ্যানচালকদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ

খুবি প্রতিনিধি

প্রকাশ : ২৭ মার্চ ২০২৫, ১০:১৩ পিএম | অনলাইন সংস্করণ

অ- অ+

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্যানচালক ও হতদরিদ্রদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ। ছবি : কালবেলা

কালবেলা

জঙ্গি নাটকে বন্দি খুবির ২ শিক্ষার্থী, ঈদে পাশে চায় সহপাঠীরা

খুবি প্রতিনিধি

প্রকাশ : ১২ মার্চ ২০২৫, ০৮:৪১ পিএম | অনলাইন সংস্করণ

খুবির হাদী চত্বরে শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন। ছবি : কালবেলা

দৈনিক জন্মভূমি

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশাখী আগমনী বার্তা

নয়া শতাব্দী

খুবিতে কবিতা ও আবৃত্তি উৎসব

কালের কণ্ঠ

বিশ্বের সাথে গ্লোবাল ক্লাইমেট স্ট্রা'ই'কে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

দৈনিক জনকণ্ঠ

খুবিতে গবেষণা প্রবন্ধ বিষয়ক কর্মশালা

খুবি সংবাদদাতা ॥ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (খুবি) রিসার্চ সোসাইটির উদ্যোগে 'মাস্টারিং ইওর থিসিস : ফ্রম ড্রাফট টু ডিফেন্স' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থী এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

শনিবার সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু একাডেমিক ভবনের সাংবাদিক লিয়াকত আলী মিলনায়তনে কর্মশালাটি শুরু হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম।

শেয়ার বিজ

বন বিট কর্মকর্তা সজল হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন

শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম কাভারেজ

আমার দেশ
THE DAILY AMAR DESH

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যতিক্রমী গণ-ইফতার

খুলনা ব্যুরো

প্রকাশ : ০৮ মার্চ ২০২৫, ১৯: ৩৩

দৈনিক জনকণ্ঠ

খুবির তরুণ কলাম লেখকদের নবীন বরণ

বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (খুবি) শাখার নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) বিকাল সাড়ে তিনটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়া প্রাঙ্গনে এ নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়।

কালবেলা

জঙ্গি নাটকে পাঁচ বছর কারাগারে খুবির দুই শিক্ষার্থী

খুবি প্রতিনিধি

প্রকাশ : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১০:৩৯ পিএম | অনলাইন সংস্করণ

14 Shares অ- অ+

২ শিক্ষার্থীর মুক্তি চেয়ে খুবি চত্বরে প্রেস ব্রিফিং করেন সহপাঠী, পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও আইনজীবীরা। ছবি : কালবেলা

দৈনিক জনকণ্ঠ

খুবি সাংবাদিক সমিতির সঙ্গে উপাচার্যের মতবিনিময়

০৮ :১৮ পিএম, ৩ নভেম্বর ২০২৪ রোববার

কালবেলা

ধর্ষকের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

খুবি প্রতিনিধি

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি : কালবেলা

দৈনিক জনকণ্ঠ

নিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপাচার্য চায় খুবি শিক্ষার্থীরা

খুবি প্রতিনিধি

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসরাইলী পণ্য বয়কটের দাবি

খুবি প্রতিনিধি

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার দাবির সাথে সংহতি প্রকাশ করে মানববন্ধন করেছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) শিক্ষার্থীরা।

সোমবার (০৪ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদি চত্বরে জড়ো হয়ে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার দাবি করে তারা মানববন্ধন করেন।

মানববন্ধনে শিক্ষার্থীরা 'মুক্ত করো ফিলিস্তিন' …

প্রতিদিনের সংবাদ

শাকিব খানের 'তুফানের' টিজারে খুবি শিক্ষার্থীর কণ্ঠ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

'যদিও আগে থেকেই জানতাম আমার গাওয়া কোরাসটুকু আসবে, তারপরও প্রথম গান বলেই হয়তো, মনে একটা অজানা ভয় কাজ করছিল। ৭ মে বিকেলের দিকে যখন তুফান-এর টিজারটি মুক্তি পেল, আর টিজারের শেষে নিজের কণ্ঠ শুনতে পেলাম, মনে হলো দুনিয়ার সব আনন্দ যেন আমার হাতে ধরা দিয়েছে।'

বলছিলেন শাকিব খানের সদ্য মুক্তি পাওয়া 'তুফান' সিনেমার টিজারের 'প্রলয়ের তুফান' অংশে কণ্ঠ দেওয়া খুবি শিক্ষার্থী সামসুরুত শুভ্র। গত মঙ্গলবার বিকেলে যখন সবার আলোচনা চলছিল শাকিব খানের 'তুফান' সিনেমার টিজার নিয়ে, তখনই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বয়ে যাচ্ছিল এক আনন্দের ঢেউ।

শুভ্র বর্তমানে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিনে চতুর্থ বর্ষে অধ্যয়ন করছেন। সঙ্গীতের সঙ্গে তার সখ্যতা ছোটবেলা থেকেই। ২০১৩ সালের দিকে তিনি লক্ষ্য স্থির করেন, প্রেক্টিস করবেন। সেই থেকে লেখাপড়ার পাশাপাশি সঙ্গীত চর্চা চলতে থাকে তার। আগ্রহের জায়গা থেকে তিলে তিলে তৈরি করে ফেলেন নিজের মিউজিক স্টুডিও। ইউটিউব দেখে ক্রমে শিখে ফেলেন স্টুডিওর কাজ। সেখানে জনপ্রিয় সব গানের কভার করে স্পটিফাইয়ে নিজের পেজে দিতে শুরু করেন। একসময় সেখানে মাসিক শ্রোতার সংখ্যা ৬০ হাজার ছাড়িয়ে যায়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন মিডিয়া হাউস থেকে কাজের সুযোগ আসতে শুরু করে তার কাছে।

'তুফান' সিনেমায় কাজের সুযোগ বিষয়ে শুভ্র বলেন, "স্পটিফাইয়ের কাজের সুবাদে ২০২১ সালে সঙ্গীত পরিচালক নাভেদ পারভেজের সঙ্গে আমি ফেসবুকে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাই। কিছুদিন আগে তিনি পোস্ট করেন- নতুন একটি গানের জন্য নতুন কণ্ঠ খুঁজছেন তিনি। সেখানে আমি আগ্রহ প্রকাশ করি। গানটি গেয়ে পাঠালে নাভেদ পারভেজ আমার কণ্ঠ পছন্দ করেন। গত এপ্রিলের শেষের দিকে তিনি আবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন সিনেমার একটি গানের কোরাস করে দেওয়ার জন্য। আমি কোরাসটি করে পাঠালে তিনি আমাকে অভিনন্দন জানান প্রথম সিনেমা ডেবিউটের কথা বলে।' শুভ্রর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিনের প্রথম সারা মনামী হোসেন বলেন, 'খবরটা শোনার পর থেকেই এত খুশি লাগছিল, যে আমি বাড়িতে গিয়ে সবাইকে একবার করে টিজারটি দেখিয়েছি। তার এই অর্জন শুধু গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিনেরই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অর্জন বলে আমি মনে করি।'

দৈনিক ডেল্টা টাইমস্

পাঁচ বছরে তারুণ্যের কণ্ঠস্বর

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি

শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম কাভারেজ

দৈনিক জনকণ্ঠ

ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে খুবিতে বিক্ষোভ

একরামুল হক, খুবি প্রতিনিধি

প্রকাশিত : ০০:৩৯, ২৩ আগস্ট ২০২৪

ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে খুবিতে বিক্ষোভ

ভারতের সাথে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা দাবি এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ডম্বুর ও গজলডোবা বাঁধ খুলে আকস্মিক বন্যা সৃষ্টির প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

যায়যায়দিন

খুবিতে ফরেস্ট্রি ক্লাবের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক বন দিবস উদযাপন

প্রকাশ | ২১ মার্চ ২০২৪, ১৯:১৬

খুবি প্রতিনিধি

'উদ্ভাবনায় বন, সমৃদ্ধতায় বন'- এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) ফরেস্ট্রি অ্যান্ড উড টেকনোলজি ক্লাবের উদ্যোগে নানা আয়োজনে আন্তর্জাতিক বন দিবস উদযাপিত হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) সকালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

পরে দুপুর দেড়টায় সংগঠনটির উপদেষ্টা সহযোগী অধ্যাপক এস.এম রুবাইয়াত আব্দুল্লাহ'র নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু একাডেমিক ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে হাদী চত্বর হয়ে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ ভবনের সামনে দিয়ে ঘুরে পুনরায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু একাডেমিক ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

এর আগে ফরেস্ট্রি অ্যান্ড উড টেকনোলজি ডিসিপ্লিনের ২২৫৩ নম্বর কক্ষে সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বন ও পরিবেশ বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সংগঠনটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

যায়যায়দিন/এসএস

নয়া শতাব্দী

খুবি শিক্ষার্থীদের অনন্য উদ্যোগ

■ খুবি প্রতিনিধি

■ মানবিক সেবায় অনুদান

■ 'চ্যারিটি ফান্ড কেইউ'-এর যাত্রা শুরু

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) ছাত্র বিষয়ক পরিচালকের দপ্তর এবং ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের (১৭ ব্যাচ) শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে যাত্রা শুরু করল 'চ্যারিটি ফান্ড কেইউ'। ভবিষ্যতে গুরুতর রোগের চিকিৎসা, বিনাসুদে ঋণ এবং উপবৃত্তি এ তিনটি খাতে এ ফান্ড থেকে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা হবে। গতকাল রোববার দুপুর আড়াইটায় ১৭ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মাহমুদ হোসেনের নিকট ৫ লাখ ৬০ হাজার টাকা হস্তান্তরের মাধ্যমে ফান্ডটি আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে।

ছাত্র বিষয়ক পরিচালকের দপ্তর সূত্রে জানা যায়, ১৭ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা যখন শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান শেষ করে তখন তাদের চিন্তাভাবনা ছিল এর উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে শিক্ষার্থীদের কাজে লাগে এরকম কিছু করা যায় কিনা। এরপরে ফান্ড গঠনের প্রাথমিক আলোচনা ১৭ ব্যাচই শুরু করে। সেই আলোচনা থেকেই পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যারিটি ফান্ড গঠন করা হয়েছে এবং সেখানে সর্বপ্রথম তারা অনুদান দিয়েছে। ইতোমধ্যে আরও অনেক ব্যাচ এখানে অনুদান প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অর্থ হস্তান্তরকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মাহমুদ হোসেন বলেন, এটি নিঃসন্দেহে অনন্য এক উদ্যোগ। তিনি দীর্ঘমেয়াদে এ ফান্ডের পরিসর বৃদ্ধির জন্য সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং ব্যাংকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোলাবোরেশনসহ নানা ধরনের পরামর্শ দেন।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিষয়ক পরিচালক প্রফেসর মো. শরীফ হাসান লিমন বলেন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সবসময় ভালো কিছুর সঙ্গে থাকে এবং তারা বার বার সেটি প্রমাণ করেছে। শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানের উদ্বৃত্ত অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য তাদের এ উদ্যোগ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কালচারে বিরল। এ রকম উদ্যোগে ১৭ ব্যাচ অগ্রদূত হিসেবে কাজ করেছে। তাদের এ শুভ কাজ আগামীতে অন্যদের অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

যায়যায়দিন

খুবির ফরেস্ট্রি ক্লাবের সভাপতি সকাল, সম্পাদক একরামুল

প্রকাশ | ১১ মার্চ ২০২৪, ২০:১৫

খুবি প্রতিনিধি

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) ফরেস্ট্রি অ্যান্ড উড টেকনোলজি ক্লাবের (ফউটক) নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ এর নবগঠিত কমিটিতে সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফউট ডিসিপ্লিনের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী এসএম নুহান হোসেন সকাল এবং সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন একই বর্ষের শিক্ষার্থী একরামুল হক।

সোমবার (১১ মার্চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু একাডেমিক ভবনে ফরেস্ট্রি অ্যান্ড উড টেকনোলজি ডিসিপ্লিনের ২২৫৩ নম্বর কক্ষে ক্লাবটির দায়িত্ব হস্তান্তর ও সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নতুন কমিটি ঘোষণা করেন সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিন প্রধান অধ্যাপক ড. রুমানা রানা।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন সহ সভাপতি তারেক রহমান সবুজ ও তানজিম আহমদ মেহিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাহুল কুমার সরকার, ট্রেজারার সোহেল রানা অন্তু, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারদিন দীপন, [illegible] সম্পাদক মামুন হাসান রাজু, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মো. ইসলাম আলী, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ইশমাম আফরোজা, প্রচার সম্পাদক আফসান আহমেদ রাজু এবং তথ্য প্রযুক্তি ও ফটোগ্রাফী সম্পাদক মোকাররম হোসেন।

এছাড়াও ক্রীড়া সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন রকন কান্তি শাহীন, সহকারী সমন্বয়ক [illegible] এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয়ক নাজমুস সাকিব, সহকারী সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ।

নতুন কমিটি ঘোষণা শেষে সুন্দরবন দিবস-২০২৪ উপলক্ষে আয়োজিত সুন্দরবন বিষয়ক সমস্যা-সমাধান ও সচেতনতা বিষয়ক প্রতিযোগিতার প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরে প্রাক্তন কমিটির বিদায়ী সদস্যদের ক্রেস্ট প্রদান ও বিদায়ী সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. গোলাম রাব্বিনু, অধ্যাপক ড. মো. নাজমুস সাদাত, অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান, অধ্যাপক ড. মো. সাদিকুর রহমান এবং সহযোগী অধ্যাপক এস.এম রুবাইয়াত আব্দুল্লাহ।

যায়যায়দিন/ এস

Bangladesh Guardian

ইসরায়েলি পণ্য বর্জনে সোচ্চার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশ : ৮ এপ্রিল ২০২৫, ১১:০৫ এএম

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদ জানিয়ে নিজ ক্যাম্পাস এবং ক্যাম্পাস সংলগ্ন ইসলামনগর রোডে ইসরায়েলি পণ্য বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন। সোমবার (৭ এপ্রিল) রাত ৯টা থেকে শিক্ষার্থীরা ইসলামনগর এলাকার দোকানগুলোতে গিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার চালান।

নিউজ কভারেজ করছেন খুবিসাস সভাপতি একরামুল হক (উপরে) ও সাধারণ সম্পাদক সুমাইয়া আক্তার (নিচে)

ছাত্রদের সমস্যা সমাধানে খুবিসাস

দৈনিক জনকণ্ঠ

খুবিতে জমি অধিগ্রহণ দাবিতে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

খুবি সংবাদদাতা ॥ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) প্রস্তাবিত ২০৩ একর জমি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে মৎস্য খামার ব্যবস্থাপকের কার্যালয় অধিগ্রহণে দীর্ঘসূত্রতার প্রতিবাদে সমাবেশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বুধবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপস্থিত হয়ে ছাত্র বিষয়ক পরিচালক প্রফেসর ড. মো. নাজমুস সাদাত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পসারণে ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ে বর্তমান উপাচার্যের নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের অবস্থান ও গৃহীত কর্মকাণ্ডসমূহ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমান প্রশাসন শিক্ষার্থীবান্ধব। ছাত্রদের যৌক্তিক দাবি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে প্রশাসনের কোনো বিরোধ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. রেজাউল করিম ভূমি অধিগ্রহণসহ বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণের জন্য ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী জহুরুল তানভীর, আয়মান আহাদ, সাজ্জাদ ইসলাম আজাদ।

নয়া শতাব্দী

আন্তর্জাতিক মুট কোর্ট প্রতিযোগিতা

আর্থিক সংকটে অংশগ্রহণ নিয়ে শঙ্কায় খুবির দল

■ খুবি প্রতিনিধি

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) আইন ডিসিপ্লিনের একটি দল জার্মানির নুরেমবার্গে আন্তর্জাতিক মুট কোর্ট প্রতিযোগিতা ২০২৪-এর চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। তবে আর্থিক সংকটের কারণে তাদের এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে সৃষ্টি হয়েছে অনিশ্চয়তা। প্রতিযোগীরা জানিয়েছেন, আগামী ২৪ থেকে ২৮ জুলাই এ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বটি অনুষ্ঠিত হবে। যাতায়াতসহ এখানে অংশ নিতে আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ তাদের প্রায় ৯ লাখ টাকা প্রয়োজন, যার ব্যবস্থা চলমান জুন মাসের মধ্যেই করতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনের (বিভাগের) পক্ষে বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবগত করা হলে তারা কিছু আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দিলেও, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। দ্রুত প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা না হলে, সুবর্ণ এই সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রতিযোগীদের। এ ব্যাপারে দলের তত্ত্বাবধায়ক আইন ডিসিপ্লিনের সহকারী অধ্যাপক মো. তারিক মোর্শেদ বলেন, বাংলাদেশের একমাত্র দল হিসেবে এ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে স্থান করে নেয়া খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দলের জন্য একটি বড় অর্জন। তবে আর্থিক সংকটের জন্য অংশগ্রহণের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে সেটা অত্যন্ত হতাশাজনক ব্যাপার হবে। তাই সবাইকে তাদের জায়গা থেকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে দলটি জার্মানি থেকে আমাদের দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনতে পারে। দলের সদস্য তন্ময় হালদার বলেন, একজন আইনের শিক্ষার্থী হিসেবে আন্তর্জাতিক একটি মুট কোর্ট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা অনেক মর্যাদাপূর্ণ বিষয়। দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো আমরা এ সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি। এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উপস্থাপন করার সুযোগ পাবো। কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্বের ১৪০টি দলের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশী দল হিসেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ দলটি নুরেমবার্গের মুট কোর্ট প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। দলের সদস্যরা হলেন আইন ডিসিপ্লিনের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী বৈশাখী খাতুন, তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী তন্ময় হালদার এবং প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী শতাব্দী দাশ।

দৈনিক ডেল্টা টাইমস

আর্থিক সমস্যার কারণে

খুবি শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত

দৈনিক কালবেলা

খুবির ক্যাম্পাস সম্প্রসারণে বাধা গল্লামারী মৎস্য খামার

শেয়ার বিজ

নানা সমস্যায় জর্জরিত খুবির বঙ্গমাতা হল

প্রতিদিনের সংবাদ

জমি অধিগ্রহণে দীর্ঘসূত্রতার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের সমাবেশ

নয়া শতাব্দী

টিউশনি থেকে ফেরার পথে খুবি শিক্ষার্থীকে মারধর

খুবি প্রতিনিধি
প্রকাশনার সময়: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ১৩:২৮

দৈনিক জনকণ্ঠ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা সম্প্রসারণের দাবিতে শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

বিবিধ কাভারেজ

দৈনিক জনকণ্ঠ

খুবির প্রশাসনিক দায়িত্বে অধ্যাপক রেজাউল করিম

খুবি সংবাদদাতা ॥ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম। পরবর্তীতে উপাচার্য নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করবেন। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্কুলের ডিন ও ডিসিপ্লিন প্রধানদের সভায় সর্বসম্মতভাবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা প্রধান (প্রশাসন) উপ-রেজিস্ট্রার দীপক চন্দ্র মন্ডল স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

খুবিতে উপাচার্য, উপ- উপাচার্য ও ট্রেজারার নিয়োগ

সংবাদদাতা, খুবি । খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) নতুন উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও ট্রেজারার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম। উপ-উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন পদার্থবিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. হারুনুর রশীদ খান। এছাড়াও নতুন ট্রেজারার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ব্যবসায় প্রশাসন ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. নূরুন্নবী।

দৈনিক জনকণ্ঠ

পৃষ্ঠা ১১

বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে খুবি উপাচার্যের মতবিনিময়

পৃষ্ঠা ১০

এনআইবি মহাপরিচালক

বায়োটেকনোলজি গ্র্যাজুয়েট নিয়োগ দাবি খুবি শিক্ষার্থীদের

কালবেলা

নির্বাচনের আগে মুগ্ধর খুনিদের বিচার করতে হবে : উপদেষ্টা ফরিদা

খুবি প্রতিনিধি

প্রকাশ : ০৯ মার্চ ২০২৫, ০৭:৩৬ পিএম | অনলাইন সংস্করণ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক 'শহীদ মীর মুগ্ধ তোরণ' উদ্বোধন অনুষ্ঠানের এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। ছবি : কালবেলা

নয়া শতাব্দী

ফিলিস্তিনে গণহত্যার প্রতিবাদে খুবি শিক্ষক সমিতির মানববন্ধন

■ খুবি প্রতিনিধি

ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি গণহত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (খুবি) শিক্ষক সমিতি। বৃহস্পতিবার দুপুরে হাদি চত্বরে এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি নৃশংসতা বন্ধের আহ্বান জানান। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ফিলিস্তিনের জনগণ নারকীয় বর্বরতার সম্মুখীন হচ্ছেন। সেখানে প্রতিনিয়ত নারী-পুরুষ এবং শিশুরা মৃত্যুবরণ করছে এবং তাদের হত্যা করার পরে তাদের যে উল্লাস তা বিভৎস। গাজায় এখন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই। ২৯১ জন অধ্যাপককে তারা হত্যা করেছে। ১৮টির মতো বিশ্ববিদ্যালয় তারা ধ্বংস করে দিয়েছে। জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলে একটার পর একটা ভেটো দিয়ে যাচ্ছে। তাদের সাথে সহযোগী হিসেবে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বেশ কিছু রাষ্ট্র। এদিকে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের বিরুদ্ধে স্যাংশন জারী করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এটি অভাবনীয়। একে একে সব আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে যাচ্ছে ইসরায়েল। তাদের যেন বাধা দেয়ার কেউ নেই। আমরা চাই মানবতার জাগরণ হোক। ইসরায়েলি বর্বরতা অবিলম্বে বন্ধ হোক। মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. এস এম ফিরোজ।

নয়া শতাব্দী

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ

■ শতাব্দী প্রতিবেদক

সর্বজনীন পেনশন স্কিম

প্রজ্ঞাপনকে বৈষম্যমূলক আখ্যা

বাতিলের দাবীতে সারা দেশে মানববন্ধন

চলতি বছরের ১৩ মার্চ অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে সব স্বশাসিত, স্বায়ত্তশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ত, সংবিধিবদ্ধ বা সমজাতীয় সংস্থা এবং তার অধীন অঙ্গপ্রতিষ্ঠানগুলোয় আগামী ১ জুলাই, ২০২৪ সাল ও তৎপরবর্তী সময়ে নতুন যোগদানকৃত সব চাকরীজীবীকে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ প্রজ্ঞাপন জারির ফলে সারা দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রতিবাদে গতকাল রোববার সারা দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির প্রতিবাদ কর্মসূচির অংশ হিসেবে মানববন্ধনে অংশ নেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। এ পেনশন ব্যবস্থাপনার আওতায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চরম বৈষম্যের শিকার হবেন বলে মত প্রকাশ করেন শিক্ষকরা। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

...দিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত কর্মবিরতি এবং পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেওয়ার কথা জানান শিক্ষক নেতারা। আগামী ৩ জুলাইয়ের মধ্যেও দাবী না মানা হলে পরদিন (৪ জুলাই) অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দেন। এরপরও দাবী না মানা হলে ১ জুলাই থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ক্লাস-পরীক্ষা চলবে না বলেও জানান তারা।

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় : সর্বজনীন পেনশন সংক্রান্ত বৈষম্যমূলক প্রজ্ঞাপন প্রত্যাহার, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য সুপার গ্রেড কার্যকর এবং স্বতন্ত্র বেতন স্কেলের দাবীতে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ও বাংলাদেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির আহ্বানে দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ঘন্টাব্যাপী হাদী চত্বরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. এস এম ফিরোজের সভাপতিত্বে ও সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. তরুণ কান্তি বোসের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য দেন এগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিনের শিক্ষক প্রফেসর ড. মো. ইয়াছিন আলীসহ আরো অনেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নির্বাহী পরিষদের সদস্যসহ বিভিন্ন পর্যায়ের শতাধিক শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। একই দাবীতে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষকরা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন। একই দাবীতে কুয়েট শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। বেলা সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার স্তম্ভ 'দুর্বার বাংলা'র পাদদেশে অনুষ্ঠিত এ মানববন্ধন কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন কুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. মো. আব্দুল হালিম।

Bangladesh Guardian

খুবিতে প্রথমবার বড় পরিসরে ঈদ জামাতের আয়োজন

খুবি প্রতিনিধি

ছবি: বাংলাদেশ গার্ডিয়ান

শেয়ার বিজ

সর্বজনীন পেনশন প্রজ্ঞাপন বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন

প্রতিনিধি, খুবি

অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারি করা সর্বজনীন পেনশনের 'প্রত্যয়' স্কিমের প্রজ্ঞাপন প্রত্যাহার এবং শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন স্কেলের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) শিক্ষকরা। গতকাল রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদি চত্বরে এ মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে শিক্ষকরা সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে বৈষম্যমূলক আখ্যা দিয়ে এর প্রজ্ঞাপন প্রত্যাহার ও শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতনস্কেল দাবি করেন। তারা বলেন, এমন বৈষম্যমূলক পেনশন ব্যবস্থা চালু হলে ভবিষ্যতে যেসব মেধাবী শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পেশায় আসবেন তাদের ভবিষ্যৎ জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মেধাবী শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পেশায় আসতে চাইবেন না। ফলে মেধাবী শিক্ষার্থীও তৈরি হবে না। এর মাধ্যমে একটি মেধাশূন্য জাতি তৈরি হবে।

দাবির বিষয়ে জানতে চাইলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেস্ট্রি অ্যান্ড উড টেকনোলজি ডিসিপ্লিনের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান সিদ্দিকী শেয়ার বিজকে বলেন, সাধারণ শিক্ষকদের এই দাবি সমগ্র শিক্ষক জাতির দাবি। আমরা চাই মেধাবী শিক্ষার্থীরা শিক্ষকতা পেশায় আসুক। কিন্তু তাদের জন্য প্রণোদনামূলক বেতন যদি না থাকে তাহলে মেধাবীরা এ পেশায় আসবে না। আমাদের দুটো দাবি হলো এই সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে প্রত্যাহার এবং শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন স্কেল দিতে হবে, যেন মেধাবী শিক্ষকরা জাতি গঠনে অংশগ্রহণ করতে পারে।

মানববন্ধনে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. এসএম ফিরোজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক পরিচালক মো. শরীফ হাসান লিমনসহ বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

বিবিধ কাভারেজ

আমার দেশ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ মীর মুগ্ধ তোরণ উদ্বোধন

খুবি প্রতিনিধি

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) প্রধান ফটক গতকাল রোববার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচিত হলো 'শহীদ মীর মুগ্ধ তোরণ' নামে। গত বছরের জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধের স্মৃতিকে অমর করে রাখতেই এই তোরণের নামকরণ করা হয়েছে।

দুপুর দেড়টায় এ তোরণের উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। উদ্বোধনের সময় তিনি বলেন, 'শহীদ মীর মুগ্ধ দেশের জন্য যে আত্মত্যাগ করেছেন, তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশপ্রেম ও ন্যায়বোধে অনুপ্রাণিত করবে।'

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. রেজাউল করিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন

একুশে সংবাদ

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের কেমন সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে খুবি?

পাপড়ি খানম, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
১২:৩৬ পিএম, ২৮ এপ্রিল, ২০২৪

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থী এসে

আমার সংবাদ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস ও রমজান উপলক্ষে ইফতার ও প্রীতিভোজ আয়োজন

আমিনুর রহমান, খুবি প্রতিনিধি প্রকাশিত: মার্চ ১১, ২০২৫, ০৮:০৬ পিএম

কালবেলা

'সাড়ে ২৩ বছর পরিবারের সঙ্গে ঈদ করতে পারিনি'

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি
প্রকাশ : ৩০ মার্চ ২০২৫, ০৪:৪২ পিএম | অনলাইন সংস্করণ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা প্রহরীরা। ছবি : কালবেলা

নয়া শতাব্দী

ইয়াং ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দেশসেরা খুবি

খুবি প্রতিনিধি

যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা সাময়িকী 'টাইমস হায়ার এডুকেশন' (টিএইচই)-এর গ্লোবাল র‍্যাংকিংয়ে বৈশ্বিক ইয়াং ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শীর্ষ স্থানে উঠে এসেছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (খুবি)। র‍্যাংকিংয়ে বৈশ্বিক তালিকায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ৪০১-৫০০ এর মধ্যে রয়েছে। যা বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সবার উপরে। এবারের প্রকাশিত ইয়াং ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ থেকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দুটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং দুটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে। গবেষণার মান, শিল্প, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি, গবেষণার পরিবেশ এবং শিক্ষাদানে মোট পাঁচটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ইয়াং ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং করা হয়েছে। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স ৫০ বছর কিংবা তার চেয়ে কম, শুধুমাত্র সেইসব বিশ্ববিদ্যালয়কে এই র‍্যাংকিয়ের আওতায় আনা হয়।

উপাচার্য প্রফেসর ড. মাহমুদ হোসেন বলেন, টানা দুইবার টাইমস হায়ার এডুকেশন র‍্যাংকিং এবং কিউএস র‍্যাংকিংয়ে স্থান পাওয়ার পর এবার টাইমস হায়ার এডুকেশনের ইয়াং ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংয়ে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান পাওয়ায় গর্বিত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার।

যায়যায়দিন

মধ্যপ্রাচ্যের আদলে গড়া খুবির কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ

প্রকাশ | ২৮ মার্চ ২০২৫, ২০:৪৪

খুবি প্রতিনিধি

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ। প্রাকৃতিক পরিবেশের আদলে নকশা করা মসজিদটি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদটি দেখলে অবাক হবে যে কেউ। মধ্যপ্রাচ্যের আদলে গড়া মসজিদটির স্থাপত্যশৈলী এতই অনন্য যে, এটি এখন খুবির অন্যতম আকর্ষণ।

এ মসজিদজুড়ে আছে অত্যন্ত ইসলামিক ঐতিহ্যবাহী জ্যামিতিক নকশা। ১৫ হাজার বর্গফুটের এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি এখন খুলনার সবচেয়ে বড় মসজিদ। তবে এরচেয়ে বড় বিষয়, এ মসজিদে নেই কোনো এয়ার কন্ডিশনার। প্রাকৃতিক বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা থাকায় এর ভেতরটা সবসময়ই শীতল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদি চত্বর হয়ে কটকা যেতেই হাতের ডান পাশে চোখে পড়বে চোখধাঁধানো মসজিদটি। তিন হাজার মুসল্লি একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারে এখানে।

মসজিদটি স্থাপন করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক মাঝে। সামনে আছে তিনটি হল। পাশে রয়েছে লাইব্রেরি এবং খুবির এক ও তিন নম্বর একাডেমিক ভবন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদের সিনিয়র ইমাম ও খতিব মুফতি আব্দুল কুদ্দুস বলেন, 'আমাদের চেষ্টা হলো মসজিদটিকে আরও সুন্দর করা।

এখান থেকে যেন ইসলামের সঠিক শিক্ষা সবাই পেতে পারে সে জন্য উপাচার্য স্যার পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মসজিদটি মুখর থাকে। ত্রিশটি কাতারে তিন হাজারেরও বেশি মুসল্লি দাঁড়াতে পারেন।' বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. এম আবদুল কাদির ভূঁইয়া ২০০৩ সালে মসজিদটি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

স্থাপত্যের তৎকালীন শিক্ষক মুহাম্মদ আলী নকী মসজিদটির প্রাথমিক নকশা করেন। তবে কিছুর কাজ শুরুর পর আর নির্মাণকাজ এগোয়নি। পরবর্তীতে সদ্য সাবেক উপাচার্য মসজিদের নির্মাণকাজ পুনরায় শুরুর পর নকশার কিছুটা পরিবর্তন আনেন। এক একর জায়গা জুড়ে সুবিশাল মসজিদটি ২০২১ সালে ২৮ আগস্ট উদ্বোধন করা হয়।

নয়া শতাব্দী

খুবিতে দুই সহস্রাধিক বৃক্ষরোপণ

শোষণ করবে ১২ হাজার কেজি কার্বন-ডাই অক্সাইড

খুবি প্রতিনিধি

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বৃক্ষরোপণ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলা ও পরিবেশের সৌন্দর্যবর্ধনে বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানবজাতিসহ প্রাণিকুলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে পরিকল্পিতভাবে পর্যাপ্ত গাছ লাগান একান্ত প্রয়োজন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পরিবেশ সুরক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়ার পাশাপাশি বছরজুড়ে সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ চলমান থাকে। এতে একদিকে পরিবেশ সুরক্ষিত থাকে, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার এবং আগত অতিথিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন। সেসব বিষয় খেয়াল রেখেই পরিবেশ সুরক্ষা ও ক্যাম্পাসের সৌন্দর্যবর্ধনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রোপণ করা হয়েছে দুই হাজারেরও বেশি গাছের চারা। ক্যাম্পাসের খানজাহান আলী হলের দক্ষিণ ও উত্তরে রাস্তার পাশে, ক্যাফেটেরিয়ার পাশে, নির্মাণাধীন জয়বাংলা ভবন থেকে ৩নং একাডেমিক ভবন পর্যন্ত রাস্তা, অদম্য বাংলার পেছনের রাস্তা, কেন্দ্রীয় মসজিদ ও খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ হলের মাঝামাঝি নিচু স্থানে, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু একাডেমিক ভবনের পাশে, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল ও অপরাজিতা হলের মাঝামাঝি স্থানে, কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের পাশে ও কেন্দ্রীয় মন্দিরসহ বিভিন্ন স্থানে কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, পলাশ, সোনালু, জারুল, হিজল ও বরুণসহ বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ, ঔষধি ও সৌন্দর্যবর্ধক বৃক্ষের চারা লাগানো হয়েছে। কম বয়স্ক একটি গাছ বছরে প্রায় ৫ হাজার ৯০০ গ্রাম কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে পারে। অন্যদিকে, ১০ বছরের বেশি পুরোনো গাছ বছরে ২২ হাজার গ্রাম কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে থাকে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত কয়েক মাসে নতুন রোপণ করা এই দুই সহস্রাধিক গাছ বছরে প্রায় ১১ হাজার ৮০০ কেজি কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে পারবে। আগামী ১০ বছর পর এ গাছগুলো বছরে শোষণ করতে পারবে প্রায় ৪৪ হাজার কেজি কার্বন ডাই-অক্সাইড।

বিবিধ কাভারেজ

কালবেলা

ছবি: পারভেজ মোশাররফ

প্রাকৃতিক বাতাসে শীতল খুবির জামে মসজিদ

সমকাল

পড়াশোনা যখন বন নিয়ে

ক্যারিয়ার

■ একরামুল হক

সবুজ বনবনানীর দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। বিভিন্ন বনাঞ্চলে ঘুরে বেড়ানো আমাদের অনেকেরই শখ। কেমন হয় যদি আপনার পড়াশোনার বিষয়ই হয় বন? পড়াশোনার সুবাদেই ঘুরতে পারেন দেশের প্রায় সব বনাঞ্চলে? এর জন্য আপনাকে বেছে নিতে হবে বনবিদ্যা বিষয়টি।

বনবিদ্যায় পড়াশোনায় সুযোগ থাকে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার।

কোথায় পড়বেন

বর্তমানে বাংলাদেশের ৫টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বন নিয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ আছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি), খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (খুবি), শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি), রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রাবিপ্রবি) ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বশেমুরকৃবি)। সব বিশ্ববিদ্যালয় মিলে আসন সংখ্যা ২১০।

পড়াশোনার বৈচিত্র্য

বনবিদ্যা মানে শুধুই গাছ নিয়ে পড়া এমন নয়, এটি একটি মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট। বনবিদ্যায় ফরেস্ট ইকোলজি, বোটানি, ডেন্ড্রোলজি, ট্রি ফিজিওলজি, জিওলজি, জেনেটিক্স, সিলভিকালচার, বায়োডাইভার্সিটি, ওয়াইল্ড লাইফ ম্যানেজমেন্ট, ফরেস্ট বায়োএনার্জি ছাড়াও উড ফিজিক্স ও মেকানিক্স, স মিলিং, স ডক্টরিং, উড কেমিস্ট্রি, ফরেস্ট ইকোনমিক্স, কৃষি বনবিদ্যা, পাল্প-পেপার টেকনোলজি, উড মোডিফিকেশন, ফরেস্ট ল, ফরেস্ট প্যাথলজি পড়ানো হয়। এ ছাড়া সাধারণত কম্পিউটার সায়েন্স, গণিত, সার্ভেয়িং, রিমোট সেন্সিং, জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম, টি সায়েন্স, পরিসংখ্যান, অ্যাকাউন্টিং বিষয়গুলোও এ বিভাগে পড়ানো হয়ে থাকে। চার বছরের বিএসসি অনার্স কোর্সটি মোট আট সেমিস্টার/টার্মে শেষ হয়। আটটি সেমিস্টারে মোট ১৬০ এর বেশি ক্রেডিট অর্জন করতে হয়। প্রতি সেমিস্টারে যেতে হয় কোন না কোন বনাঞ্চলে।

বিদেশে পড়ার সুযোগ

বনবিদ্যায় পড়ালেখা করে বিদেশে পড়তে যাওয়ার অনেক সুযোগ রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই বনবিদ্যার ওপর অনার্স, মাস্টার্স, পিএইচডি এবং ডিপ্লোমা কোর্স রয়েছে। বনবিদ্যায় স্নাতক অসংখ্য বাংলাদেশি শিক্ষার্থী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বৃত্তি নিয়ে পড়ালেখা করছেন।

চাকরির সুযোগ

সরকারি পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ফরেস্ট ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন, স্পেস রিসার্চ এ্যান্ড রিমোট সেন্সিং অর্গানাইজেশন অব বাংলাদেশের ফরেস্ট্রি সেক্টর, আইইউসিএন, জাতীয় উদ্যান, ইকোপার্ক, সাফারি পার্ক, বন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটে চাকরির সুযোগ রয়েছে।

এর বাইরে বনবিদ্যা স্নাতকদের জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। ❖

বনবিদ্যায় পড়ালেখা করে বিদেশে পড়তে যাওয়ার অনেক সুযোগ রয়েছে

দৈনিক জনকণ্ঠ

খুবিতে জাতীয় সিম্পোজিয়াম

খুবি সংবাদদাতা ■ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে (খুবি) 'ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া কোলাবরেশন ফর আইসিটি-এনাবল্ড বাংলাদেশ' শীর্ষক দুদিনব্যাপী জাতীয় সিম্পোজিয়াম শুরু হয়েছে। শনিবার সকালে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) ডিসিপ্লিনের আয়োজনে ড. সত্যেন্দ্রনাথ বসু একাডেমিক ভবনের ইউআরপি লেকচার থিয়েটারে এ সিম্পোজিয়াম শুরু হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. রেজাউল করিম। তিনি বলেন, উন্নত দেশগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষক তৈরিতে ইন্ডাস্ট্রির দায় অনেক বেশি। সেজন্য সেসব দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে শিক্ষার্থীদের গবেষণায় অর্থায়ন করে ভালো ভালো গবেষককে বের করে আনে ইন্ডাস্ট্রিগুলো। কিন্তু আমাদের দেশে ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া কোলাবরেশন এখনো সেভাবে ডেভেলপ করেনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. হারুনর রশিদ খান এবং ট্রেজারার প্রফেসর ড. মো. নূরুন্নবী। দুদিনব্যাপী এ সিম্পোজিয়ামের প্রথম দিনে 'সিম্পোজিয়াম টক' ও 'ইনোভেশন শোকেসিং' শীর্ষক দুটি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ডিসিপ্লিন প্রধানি প্রফেসর ড. আবু শামীম মোহাম্মদ আরিফের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিম্পোজিয়াম আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ও সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনের প্রফেসর ড. কাজী মাসুদুল আলম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থী রাধিকা চৌধুরী ও সাকিব মাহমুদ শোভন।

কালবেলা

শতাধিক ধানের জাত নিয়ে খুবি শিক্ষার্থীদের গবেষণা

উপকৃত হবেন কৃষক

কালবেলা

রাঙ্গুনিয়ার পাখির রাজ্যে

কালবেলা

গবেষণা

মাটি ছাড়া ঘাস উৎপাদনে সফল

বিবিধ কাভারেজ

THE DAILY Messenger

How movies could stop the Israel-Palestine conflict, but are doing the Opposite

KHALID AHAMMED

> Movies are a potent medium, capable of shaping public opinion and fostering empathy. They can transcend cultural barriers and bring human stories to the forefront. However, when it comes to the Israel-Palestine conflict, the film industry has often failed to live up to this potential. Instead of fostering understanding, many films have reinforced existing biases and dehumanised one side of the conflict. By consistently portraying Palestinians as aggressors or terrorists, these films contribute to a skewed narrative that influences public perception and policy decisions, further entrenching the conflict

In the 2013 film "World War Z," a particularly controversial scene takes place in Jerusalem. The city, surrounded by towering walls, has seemingly found a way to keep the zombie apocalypse at bay. As the protagonist, Gerry Lane, arrives, he meets Mossad agent Jurgen Warmbrunn, who explains that Israel built the walls to protect against the undead after intercepting early warnings. While this scene might seem like just another moment in a thrilling zombie movie, it carries deeper, unsettling connotations. The depiction of Palestinians as an uncontrollable, invading force breaching the walls of Jerusalem is a stark metaphor, raising eyebrows and sparking debate about its real-world implications.

Perpetuating Stereotypes and Biases

"World War Z" is not alone in its controversial portrayal of the Israel-Palestine conflict. Several other films have been criticised for reinforcing negative stereotypes about Palestinians and influencing public perception in ways that exacerbate tensions. For instance, Otto Preminger's "Exodus" (1960) presents the founding of Israel in a heroic light, largely ignoring the displacement of Palestinians. Steven Spielberg's "Munich" (2005), while humanising both sides to some extent, focuses primarily on Israeli retaliation, subtly reinforcing the narrative of justified defense against Palestinian aggression. Similarly, action films like "The Delta Force" (1986) and "True Lies" (1994) depict Arabs, often perceived as stand-ins for Palestinians, as faceless villains, perpetuating harmful stereotypes.

Suppressed Voices

On the flip side, numerous films that present the Palestinian perspective have struggled to gain traction or faced outright suppression. "Paradise Now" (2005) by Hany Abu-Assad delves into the lives of two Palestinian friends recruited for a suicide bombing, offering a nuanced view of their motivations. Despite its critical acclaim, including a Golden Globe win and an Academy Award nomination, it faced significant controversy and protests. "5 Broken Cameras" (2011), directed by Emad Burnat and Guy Davidi, documents non-violent resistance in a Palestinian village. While it was nominated for an Academy Award, its distribution was limited and it faced severe backlash.

"Jenin, Jenin" (2002), a documentary by Mohammed Bakri, portrays the aftermath of the Battle of Jenin through the eyes of Palestinian residents. The film was banned in Israel for several years and faced legal challenges. Annemarie Jacir's "Salt of This Sea" (2008) and "When I Saw You" (2012) provide poignant narratives of Palestinian life and struggles but encountered limited distribution and visibility. Despite their powerful storytelling and critical acclaim, these films failed to reach a broad audience, overshadowed by more commercially successful, biased narratives.

The power and responsibility of cinema

Movies are a potent medium, capable of shaping public opinion and fostering empathy. They can transcend cultural barriers and bring human stories to the forefront. However, when it comes to the Israel-Palestine conflict, the film industry has often failed to live up to this potential. Instead of fostering understanding, many films have reinforced existing biases and dehumanised one side of the conflict. By consistently portraying Palestinians as aggressors or terrorists, these films contribute to a skewed narrative that influences public perception and policy decisions, further entrenching the conflict. Despite their potential to foster understanding, many films that present the Palestinian perspective struggle to gain traction or face outright suppression. Movies like "Paradise Now" and "Salt of This Sea" provide poignant narratives of Palestinian life and struggles but often encounter limited distribution and visibility. This suppression stems from political and cultural pressures that favour dominant narratives and marginalise dissenting voices. To stop the war, the film industry must embrace its responsibility to present balanced, empathetic stories that reflect the complexities and humanity of all sides involved. By supporting diverse narratives and demanding nuanced storytelling, audiences can drive the industry to use its influence responsibly, promoting understanding and empathy, and ultimately contributing to a more informed and compassionate world.

A Call for Change

The film industry has the power to shift perspectives and promote peace. To do this, filmmakers must strive for balanced, nuanced storytelling that humanises all sides of the conflict. Highlighting shared humanity, presenting historical contexts accurately, and showcasing stories of coexistence and peace initiatives can foster empathy and understanding. Filmmakers should challenge stereotypes and resist the temptation to simplify complex issues for the sake of sensationalism. As audiences, we must demand more from the film industry. We should support films that offer diverse perspectives and challenge our preconceived notions. By doing so, we can encourage a cinematic landscape that not only entertains but also educates and fosters dialogue. In the current climate, where the Israel-Palestine conflict remains a contentious and painful issue, the film industry has a unique responsibility. It can be a force for division or a catalyst for understanding and peace. The choice is ours to make.

The writer is a 3rd year student of Mass Communication and Journalism Discipline at Khulna University. He could be reached at khalidahammedot@gmail.com.

দৈনিক জনকণ্ঠ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

একটি সবুজ স্বপ্নের পথে ফরেস্ট্রি ক্লাব

একরামুল হক

পরিবেশ সচেতনতা এবং শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেস্ট্রি অ্যান্ড উড টেকনোলজি ক্লাব। ২০২০ সালে শুরু হওয়া এই ক্লাবটি মাত্র তিন বছরের মধ্যেই পরিবেশ রক্ষায় তরুণদের অগ্রণী ভূমিকায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বন, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠন এবং দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করছে সংগঠনটি। সাম্প্রতিক সময়ে তাদের 'প্লাস্টিক দিন, গাছ নিন' নামে একটি কর্মসূচি বেশ সাড়া ফেলেছিল। এখানে তারা প্রায় ৩০ বস্তা প্লাস্টিক সংগ্রহ করে তার বিনিময়ে ৯০০টি ফলদ, বনজ, ঔষধি এবং সৌন্দর্যবর্ধক গাছ বিতরণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পাশাপাশি ক্যাম্পাসের আশপাশের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ এই কার্যক্রমে অংশ নেন এবং এটি ব্যাপক প্রশংসিত হয়।

'প্রকৃতির জন্য পাখি, গাছে গাছে মাটির হাঁড়ি' স্লোগানে পাখিদের অবাধ বিচরণ, নিরাপদ আশ্রয় তৈরি ও তাদের বংশবৃদ্ধির জন্য গাছে গাছে শতাধিক মাটির হাঁড়ি বসিয়েছে ক্লাবটির সদস্যরা। বৃষ্টির পানি ঢুকলেও যেন সমস্যা না হয় সেজন্য হাঁড়িগুলোতে ছোট ছোট ছিদ্র করে দিয়েছিল তারা। ক্যাম্পাসে পাখির অবাধ বিচরণ বৃদ্ধি করাই ছিল এই কাজের উদ্দেশ্য। এরকম বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা ও সচেতনতা তৈরি করে সবুজ স্বপ্নের পথে হাঁটছে ক্লাবের শতাধিক স্বপ্নবাজ তরুণরা। এ বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের ব্যতিক্রমী ভাবনা থেকে সুন্দরবনের তেলবাহী নৌযান ডুবি সমস্যার সমাধানে ছয়টি প্রস্তাবনা দেয় ক্লাবের সদস্যরা। এছাড়াও বিভিন্ন সময় বৃক্ষরোপণসহ বিভিন্ন সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজ তারা করে থাকে।

নিজেদের খরচ থেকে কিছুটা বাঁচিয়ে সেখান থেকে চাঁদা তুলে ফরেস্ট্রি ক্লাবের সদস্যরা যেভাবে প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য কাজ করে যাচ্ছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে ক্লাবটির সভাপতি এসএম নুহাশ হোসেনের স্বপ্ন অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এবারের বর্ষায় প্লাস্টিকের বিনিময়ে গাছ প্রোগ্রামটি আরও বৃহৎ আকারে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তার। তাদের এই অদম্য মনোবল অন্য তরুণদের জন্য অনুপ্রেরণা। তরুণদের এই অক্লান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমাদের পৃথিবী হবে আরও বাসযোগ্য।

প্রতিদিনের সংবাদ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল রোডে খান জাহান আলী রেস্তোরাঁ। ছবি [illegible] ■ প্রতিদিনের সংবাদ

হল রোডের রেস্তোরাঁ

■ খালিদ আহম্মেদ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন হল রোডের রেস্তোরাঁগুলো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খাবার-দাবারের শেষ ভরসাস্থল। কিন্তু ঈদের পর এখানে সব রেস্তোরাঁয় খাবারের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বেকায়দায় পড়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর ক্যান্টিন ও ডাইনিং সাধারণত ঈদের পর কিছুদিন বন্ধ থাকে। এবারও যথারীতি ক্যান্টিন ও ডাইনিং বন্ধ ছিল। ঈদের ছুটি কাটিয়ে ক্যাম্পাসে ফিরে আসা শিক্ষার্থীদের খাবারের জন্য একমাত্র ভরসাস্থল এখন হলরোডের রেস্তোরাঁগুলো। কিন্তু সেখানে খেতে গিয়ে খাবারের মূল্য তালিকা দেখে মাথায় হাত পড়ছে শিক্ষার্থীদের। এর আগেও বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে কয়েক দফায় দাম বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এবার যে চড়া দাম তাতে শিক্ষার্থীরা খুবই বেকায়দায় পড়েছেন। শিক্ষার্থী যারা অনেকেই টিউশন ও খণ্ডকালীন কাজ করে নিজেদের খরচের জোগান দেন তাদের একবেলা খেয়ে দিন পার করতে হচ্ছে।

হলরোডের খান জাহান আলী ও মামা-ভাগ্নে রেস্তোরাঁয় খোঁজ নিয়ে দেখা যায় ভাতের দাম এক প্লেট রাখা হচ্ছে ১৫ টাকা, পরোটা ১০ টাকা, পাঙাশ মাছ ৫০ টাকা পিস, রুইমাছ ৬০ টাকা পিস, মাংস ৫০ টাকা পিস, সবজি ১৫ টাকা (হাফ)। যেখানে কিছুদিন আগেই ভাত ১০ টাকা, রুই মাছ ৫০ টাকা, সবজি ১০ টাকা, মুরগি ৪০-৪৫ টাকার মধ্যে ছিল। এ বিষয়ে হল রোড এলাকায় ঘরভাড়া নিয়ে বসবাসরত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সৈয়দ ইয়াসির আরাফাত বলেন, 'সেই যে মুরগির পিসের দাম একবার বাড়ল, মুরগির কেজি কমার পরও কিন্তু বাড়তি দামই রেখে দেওয়া হয়েছিল। এ অবস্থায় আবার দাম বাড়ানো হলো। শুধু এক ডিম আর ভাত খেতে

■ এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

খোলা কাগজ

গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত বধ্যভূমির ওপর অবস্থিত দক্ষিণাঞ্চলের অন্যতম সেরা বিদ্যাপীঠ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ঘেরা এই বিশ্ববিদ্যালয়। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারদিকে খেলা করে প্রকৃতির এক নির্মল ভালোবাসা, সঙ্গে জারুল, পলাশ, পদ্মপুকুর আর পাখিদের সঙ্গে চলে অনিন্দ্যসুন্দর মিতালি। গত ২৫ নভেম্বর ছিল খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। ১৯৯১ সালের এই দিনে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের অন্যতম সেরা এ বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত হয়েছে তার ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন ও নানাবিধ প্রত্যাশা তুলে ধরেছেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী আলকামা রমিন।

খুবি হবে 'ইমপ্যাক্টফুল বিশ্ববিদ্যালয়'

প্রফেসর ড. মো. রেজাউল করিম
উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

খুবির সংকট-সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

একরামুল হক
সভাপতি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি

ক্যাম্পাসে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হোক

[illegible]

সমাধান হোক আবাসন সংকট

[illegible]

ফিরে দেখা

৪র্থ কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যক্রম

খুবিসাস কার্যনির্বাহী কমিটি-২০২৪ এর নির্বাচন শেষে

খুবিসাস ৪র্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী কেক কেটে উদযাপন

খুবিসাস কার্যনির্বাহী কমিটি-২০২৪ এর দায়িত্ব গ্রহণ

সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নে কর্মশালা

খুবিসাস ৪র্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী র‍্যালী

খুবি উপাচার্যের সাথে মতবিনিময়

ফিরে দেখা

৪র্থ কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যক্রম

খুবিসাস মাসিক সাধারণ সভা

সেরা রিপোর্টার পুরস্কার প্রদান

নবীন সদস্য বাছাই সাক্ষাৎকার গ্রহণ

ফিরে দেখা

৪র্থ কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যক্রম

খুবি মেডিকেল সেন্টার পরিদর্শনে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ

বিভিন্ন সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের সৌজন্য সাক্ষাৎ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ফেয়ার-২০২৫

খুবিসাস ৫ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী কেক কেটে উদযাপন

খুবিসাস আয়োজিত সাংবাদিকতা ও ক্যারিয়ার বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ইফতার মাহফিল

খুবিসাস ৫ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে র‍্যালি

সারাদেশের সাংবাদিকদের পাশে খুবিসাস

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
সাংবাদিক সমিতি (খুবিসাস)

খুবিসাস ৪র্থ কার্যনির্বাহী পরিষদ

সভাপতি
একরামুল হক

সহ-সভাপতি
মুহিব্বুল্লাহ

সাধারণ সম্পাদক
সুমাইয়া আক্তার

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
প্রাণ প্রতিম কুণ্ডু

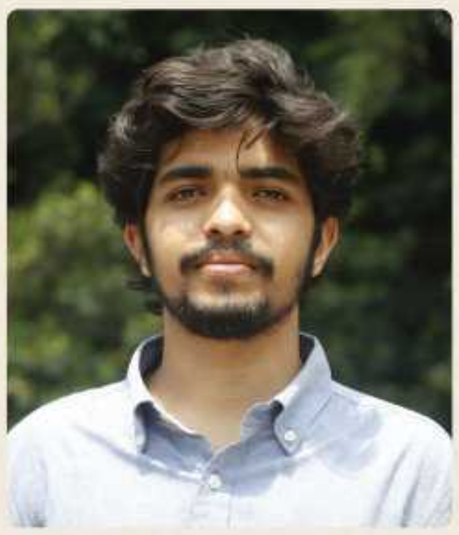

সাংগঠনিক সম্পাদক
আলকামা রমিন

অর্থ সম্পাদক
খালিদ আহমেদ

দপ্তর সম্পাদক
আমিনুর রহমান

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
পাপড়ি খানম

কার্যনির্বাহী সদস্য
মো. মিরাজুল ইসলাম

কার্যনির্বাহী সদস্য
ফারুক খান

কার্যনির্বাহী সদস্য
গোলাম মোস্তফা

খুবিসাস ৪র্থ কার্যনির্বাহী পরিষদ

সাধারণ সদস্যবৃন্দ

মো. নাঈমুর রহমান

তানভীর হাসান তন্ময়

মো. আবির হাসান

মেহেদী হাসান

মো. জেহান উদ্দিন মৃধা

মো. ইকরামুল ইসলাম ইকরা

এইচ এম মাসুম হাসান

ইব্রাহিম খলিল

প্রভাতী দাস

সানজিদা আক্তার

মোঃ হাসিবুল হাসান

কে এম হাবিবুল্লাহ সাকিব

অর্ক মন্ডল

মোঃ মারুফ আহম্মেদ

নাহিদ হাসান

মো. আবিদ হাসান

মোঃ মাহমুদ শেখ

নুসরাত সুলতানা

ফাহাদ খন্দকার

মো: মাহফুজ আহম্মেদ

ইউসুফ আলী

সাইফুল ইসলাম

তানিয়া তাবাসসুম

জাহিদা সুলতানা রিমা

অর্পিতা

রাতুল খান

মোকাররম বিল্লাহ

রেজওয়ান আহম্মেদ

মো. যায়েদ বিন সিদ্দিক

জান্নাতুল ফেরদৌস মীম

খুবিসাস কার্যনির্বাহী পরিষদ-২০২৪ কে সারা দেশের বিভিন্ন ক্যাম্পাস

সাংবাদিক সংগঠনের শুভেচ্ছাবার্তা

খুবিসাস ৩য় কার্যনির্বাহী পরিষদ

সভাপতি

রেজওয়ান আহম্মেদ

সহ-সভাপতি

জান্নাতুল ফেরদৌস মীম

সাধারণ সম্পাদক

মো. যায়েদ বিন সিদ্দিক

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক

তানজীম তালহা

সাংগঠনিক সম্পাদক

একরামুল হক

অর্থ সম্পাদক

মুহিব্বুল্লাহ

দপ্তর সম্পাদক

প্রাণ প্রতিম কুণ্ডু

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

সুমাইয়া আক্তার

কার্যনির্বাহী সদস্য

আমিনুর রহমান

কার্যনির্বাহী সদস্য

মো. নাঈমুর রহমান

কার্যনির্বাহী সদস্য

তানভীর হাসান তন্ময়

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
সাংবাদিক সমিতি (খুবিসাস)

খুবিসাস ২য় কার্যনির্বাহী পরিষদ

সভাপতি
অনিরুদ্ধ বিশ্বাস

সহ-সভাপতি
নিগার সুলতানা

সাধারণ সম্পাদক
শরিফুল ইসলাম

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
মো. রুবায়েত হোসেন

সাংগঠনিক সম্পাদক
রেজওয়ান আহম্মেদ

অর্থ সম্পাদক
মশিউর রহমান

দপ্তর সম্পাদক
মো. আকিল খান

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
একরামুল হক

ক্রিড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মো. যায়েদ বিন সিদ্দিক

কার্যনির্বাহী সদস্য
মুহিব্বুল্লাহ

কার্যনির্বাহী সদস্য
প্রাণ প্রতিম কুণ্ডু

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
সাংগঠনিক সমিতি (খুবিসাস)

খুবিসাস ১ম কার্যনির্বাহী পরিষদ

সভাপতি
তেহসিন আশরাফ প্রত্যয়

সহ-সভাপতি
শাওন শেখ শুভ

সাধারণ সম্পাদক
মীর হাসিব

সাংগঠনিক সম্পাদক
মো.শফিক ইসলাম

দপ্তর সম্পাদক
জি এম জাহাঙ্গীর আলম

প্রচার সম্পাদক
মেহেদী হাসান বাপ্পী

অর্থ সম্পাদক
অনিরুদ্ধ বিশ্বাস

কার্যনির্বাহী সদস্য
শরিফুল ইসলাম

কার্যনির্বাহী সদস্য
মশিউর রহমান

কার্যনির্বাহী সদস্য
মো. রুবায়েত হোসেন

কার্যনির্বাহী সদস্য
রেজওয়ান আহম্মেদ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীতের সকাল

ছবি: আব্দুল মান্নান রাসেল

ENVISION
REALESTATE LTD

HAMID TOWER

61, SOUTH CENTRAL ROAD
(BESIDE NARGIS MEMORIAL HOSPITAL),
KHULNA

FLAT FOR SELL

UNIT A- 1910 SFT (4 BED HOME)
UNIT B- 1610 SFT (3 BED HOME)

FOR BOOKING
+880 1711 293545
+880 1711 293546

ENVISION
REALESTATE LTD

RAHMAN TOWER

SONADANGA 2ND PHASE,
ROAD NO 14,
KHULNA

FLAT FOR SELL

UNIT A- 1780 SFT

FOR BOOKING
+880 1711 293545
+880 1711 293546

ADDRESS: 18/A EDEN PLAZA, KDA NEW MARKET, KHULNA.
E-MAIL: ENVISION.KHULNA@GMAIL.COM